অধ্যায় ৩

মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
Human Physiology : Digestion & Absorption

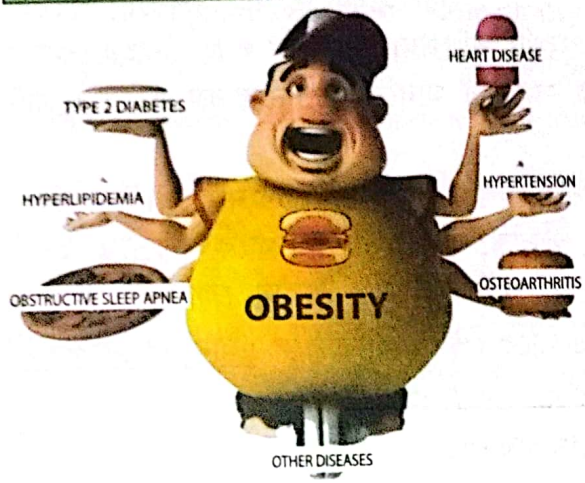

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- পরিপাক
- টায়ালিন
- পিত্তরস
- গ্যাস্ট্রিন
- BMI
- স্থূলতা

মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ পরিচালনা, শক্তি সরবরাহ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে **পুষ্টি** (nutrition)। **খাদ্য** (food)-ই মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমে সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোষে প্রবেশের উপযোগী হয়। সবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত খাদ্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া	পাঠ ১	মুখগহ্বরে সংঘটিত খাদ্য পরিপাক
❐ পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক	পাঠ ২	পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক
❐ যকৃতের সঞ্চয়ী এবং বিপাকীয় ভূমিকা	পাঠ ৩	যকৃতের কাজ
❐ বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম	পাঠ ৪	অগ্ন্যাশয়ের কাজ
❐ গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র এবং গ্যাস্ট্রিক হরমোনের ভূমিকা	পাঠ ৫	পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা
❐ খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ	পাঠ ৬	ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক
❐ ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন হতে রক্তজালিকা এবং ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ	পাঠ ৭	ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য উপাদানের শোষণ
❐ বৃহদন্ত্রের কাজ	পাঠ ৮	শোষিত খাদ্যসার পরিবহন ও এর পরিণতি
❐ ব্যবহারিক : পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৯	বৃহদন্ত্রের কাজ
❐ স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ	পাঠ ১০	ব্যবহারিক : যকৃত, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ
	পাঠ ১১	স্থূলতা

পরিপাক (Digestion)

যে প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং দেহকোষের গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। যে আঙ্গিক তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে **পৌষ্টিকতন্ত্র** (digestive system) বলা হয়।

পরিপাক প্রক্রিয়া কতকগুলো ধারাবাহিক **যান্ত্রিক** ও **রাসায়নিক** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. **যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical Digestion)** : পরিপাকের সময় যে প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যের পরিশোষণযোগ্য অংশ চিবানো, গলাধঃকরণ ও পৌষ্টিকনালি অতিক্রমের সময় নালির বিভিন্ন অংশের পেশল সঞ্চালনের ফলে গাঠনিক ভাঙনের (physical breakdown) মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটায় (increases the surface area for the action of the digestive enzymes) তাকে **যান্ত্রিক পরিপাক** বলে।

২. রাসায়নিক পরিপাক (Chemical Digestion) : পরিপাকের সময় গৃহীত খাদ্যের পরিপাকযোগ্য অংশ যান্ত্রিক পরিপাকের পরপরই মুখ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে এসিড, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় রাসায়নিক ভাঙনের (chemical breakdown) মাধ্যমে দেহকোষের গ্রহণীয় উপাদানে পরিণত হওয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

মানব পৌষ্টিকতন্ত্র / পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (Different Parts of Human Digestive System)

বেঁচে থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি। আমাদের গ্রহণ করা অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ জটিল অণু হিসেবে গৃহীত হয় যা ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত দেহের কোনো কাজে আসে না। খাদ্য পরিপাক উপযোগী কতগুলো অঙ্গ ও গ্রন্থির সমন্বয়ে মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র গঠিত। এটি পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রন্থি সমন্বয়ে গঠিত।

পৌষ্টিকনালি (Digestive Tract) : মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পেশিবহুল প্যাঁচানো নালিটির নাম পৌষ্টিকনালি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮-১০ মিটার। এতে মুখ, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র ও পায়ু থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা–ডিওডেনাম,,জেজুনাম ও ইলিয়াম। বৃহদন্ত্রও তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-সিকাম, কোলন ও মলাশয়।

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands) : পরিপাকরস ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলোকে পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানুষের দেহে পাঁচ প্রকারের পৌষ্টিকগ্রন্থি থাকে, যথা-লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি ও আন্ত্রিকগ্রন্থি।

মানব পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো–

পৌষ্টিকতন্ত্র

পৌষ্টিকনালি

১. মুখছিদ্র
২. মুখবিবর বা মুখগহ্বর
৩. গলবিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ১২.৫ সেমি)
৪. অন্ননালি (দৈর্ঘ্য ২৩–২৫ সেমি)
৫. পাকস্থলি (দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ সেমি, প্রস্থ প্রায় ১৫ সেমি)
   ক. কার্ডিয়া
   খ. ফানডাস
   গ. বড় বাঁক
   ঘ. ছোট বাঁক
   ঙ. পাইলোরাস
৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (দৈর্ঘ্য প্রায় ৬-৭ মিটার)
   ক . ডিওডেনাম
   খ. জেজুনাম
   গ. ইলিয়াম
৭. বৃহদন্ত্র (দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার)
   ক. সিকাম
   খ. কোলন
      i. উর্ধ্বগামী
      ii. অনুপ্রস্থ
      iii. নিম্নগামী
      iv. সিগময়েড
   গ. মলাশয়
৮. পায়ু

পৌষ্টিকগ্রন্থি

১. লালাগ্রন্থি
২. যকৃত
৩. অগ্ন্যাশয়
৪. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি
৫. আন্ত্রিকগ্রন্থি

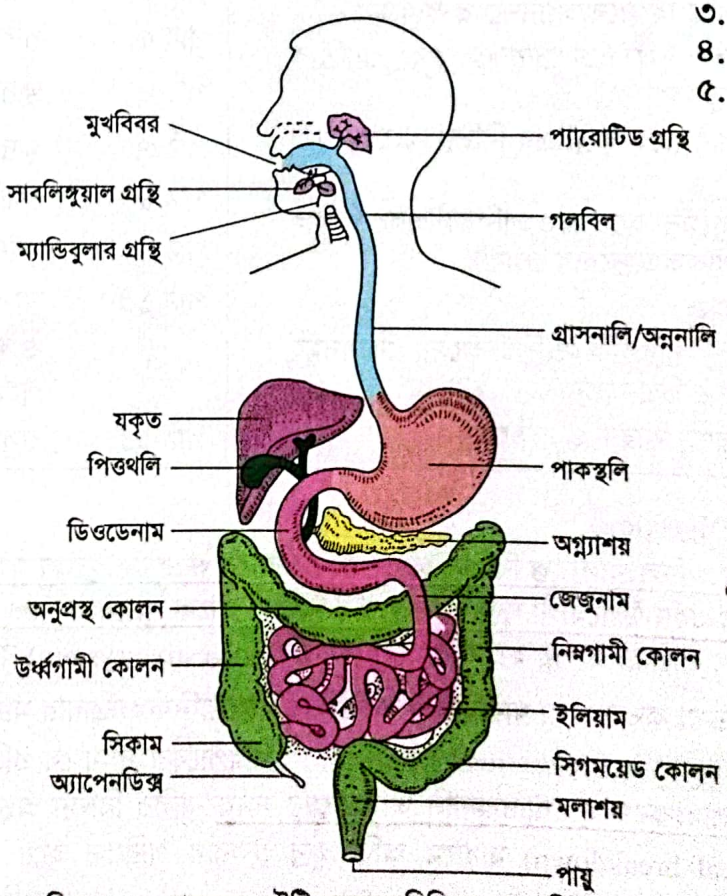

চিত্র ৩.২ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (চিত্রানুগ)

মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক নিম্নোক্ত ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. খাদ্য ও পানি গলাধঃকরণ (Ingestion of food & water)
২. পৌষ্টিকনালিতে খাদ্যের সঞ্চালন (Movement of food along the alimentary canal)
৩. খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion of food)
৪. খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion of food)
৫. পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ (Absorption of digested food & water)
৬. বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশন (Elimination of undigested materials)

মানুষ সর্বভুক (omnivorus) প্রাণী। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের খাদ্যই এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানই রয়েছে। তবে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জটিল হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বাকি তিনটি খাদ্যোপাদান, যেমন–ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি কোষে সরাসরি গৃহীত হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। **সঠিক পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি নিয়ে গঠিত যে খাদ্য কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাকে সুষম খাদ্য** (balanced diet) বলে। নিচে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতিদিনের সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
১. শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫–৬০০ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. আমিষ (Protein)	১০০–১৫০ গ্রাম	দেহের বৃদ্ধি, কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
৩. স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০–৫৫ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ।
৪. ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০–৫৬০০ মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
৫. খনিজ লবণ (Mineral)	৮–১০ গ্রাম	স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৬. পানি (Water)	২–৩ লিটার	প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Human Digestion)

মানুষে অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ অণু হিসেবে মুখগহ্বরে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর এমন বৃহত্তর জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্রতম অণুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত মানবদেহের কোন কাজে আসে না। তাই শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য এ তিনটি খাদ্যের উপাদানকে পরিপাক করতে হয়। নিচে খাদ্য উপাদানের নাম, পরিপাককারী এনজাইম ও উৎপন্ন দ্রব্য ছক আকারে উপস্থাপিত হলো।

খাদ্যের উপাদান	প্রধান এনজাইম	উৎপন্ন দ্রব্য
শর্করা (Carbohydrate) (ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সবজি)	অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম (Amylolytic enzymes) (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ (Protein) (মাছ, মাংস, ডিম, ডাল)	প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzymes) (পেপসিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন)	অ্যামিনো এসিড
স্নেহদ্রব্য (Lipid) (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক এনজাইম (Lipolytic enzymes) (পাকস্থলিয় ও আন্ত্রিক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

মুখবিবরে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Buccal Cavity)

মানুষের পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৮–১০ মিটার লম্বা। পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসাছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠোঁটে বেষ্টিত। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর বা মুখবিবরে প্রবেশ করে।

মুখপরবর্তী গহ্বরটি মুখগহ্বর। একে ঘিরে এবং এর ভিতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা ও তালু প্রধান।

মুখগহ্বরের উর্ধ্বপ্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি দিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থিনির্মিত ও শক্ত (hard palate), পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম (soft palate)। কোমল তালুর পিছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল আলজিভ (uvula) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।

নিম্ন চোয়ালের অস্থির সাথে জিহ্বা যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির স্বাদকুঁড়ি (taste buds)। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জিহ্বায় সাধারণত ১০,০০০ স্বাদকুঁড়ি থাকে। স্বাদকুঁড়িগুলো খাদ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল। যেমন-জিহ্বার অগ্রপ্রান্তে মিষ্টি, অগ্রভাগের দুপাশে নোনা, পশ্চাৎভাগের দুপাশে টক (অম্লতা) এবং পিছন দিকে তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করে। ঝাল জাতীয় খাবারের জন্য কোন স্বাদকুঁড়ি নেই। তবে ঝালজাতীয় খাদ্য জিহ্বায় জ্বালা (irritation) ঘটায়। পাঁচ-দশ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘষায় স্বাদকুঁড়ি নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিস্থাপিত হয়।

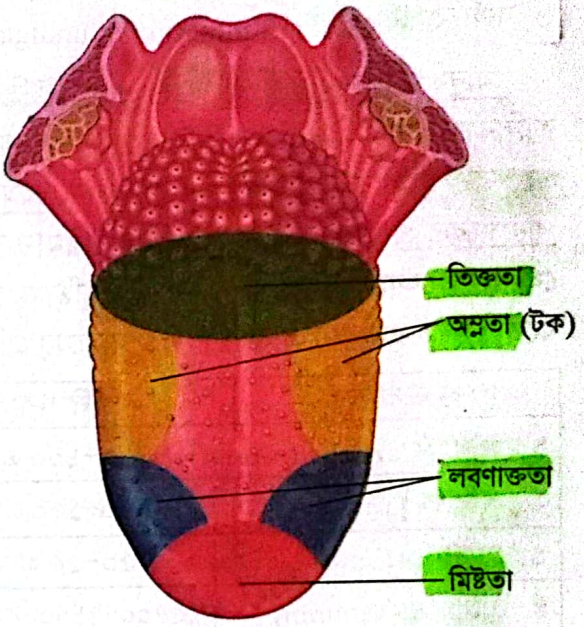

চিত্র ৩.৩ : বিভিন্ন প্রকার স্বাদকুঁড়ি

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া লালাগ্রন্থি (salivary gland) অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে দুপাশের কানের নিচে প্যারোটিড গ্রন্থি (parotid gland), নিচের চোয়ালের ভিতর দিকে ম্যান্ডিবল-এর নিচে সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (submandibular gland) এবং জিহ্বার তলায় সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (sublingual gland)। গ্রন্থিগুলো রস ক্ষরণকারী এবং এপিথেলিয়ামে আবৃত গোল বা ডিম্বাকার থলি (sac) বিশেষ। থলির প্রাচীরে যে সেরাস কোষ ও মিউকাস কোষ রয়েছে তা থেকে রস ক্ষরিত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা (saliva) কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%-৯৯.৫%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০–১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে।

মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দুভাবে পরিপাক হয়– যান্ত্রিক (mechanical) ও রাসায়নিক (chemical)।

যান্ত্রিক পরিপাক

- সামান্যতম স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে সংকেত পায় তার প্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোতে লালা ক্ষরণের বার্তা পাঠায়। লালা মূলত পানিতে গঠিত এবং খাদ্যকে এমনভাবে নরম ও মসৃণ করে যাতে দাঁতের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়। তাছাড়া গৃহীত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকলে তাও বিনষ্ট হয়।
- চার ধরনের দাঁত যেমন– কর্তন (Incisor), ছেদন (Canine), অগ্রপেষণ (Pre-molar) ও পেষণ (Molar)-এর নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বড় খাদ্যখণ্ড কাটা-ছেঁড়া, পেষণ-নিষ্পেষণ শেষে হজম উপযোগী ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।
- জিহ্বা নড়া-চড়া ও সঙ্কোচন-প্রসারণক্ষম পেশল অংশ। এটি স্বাদ নেয়া ছাড়াও দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা সরাতে, মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দাঁতের নিচে পৌছাতে, লালা মিশ্রণে এবং সবশেষে গিলতে সাহায্য করে।

- যান্ত্রিক পরিপাকের সময় খাদ্যদ্রব্য নিষ্পেষিত হয়ে নরম খাদ্যমণ্ড (bolus)-তে পরিণত হয়। জিহ্বার উপরতল যখন খাদ্যমণ্ডকে শক্ত তালুর (hard palate) বিপরীতে রেখে চাপ দেয় তখন খাদ্যমণ্ড পিছন দিকে যেতে বাধ্য হয়।
- পিছনে কোমল তালু (soft palate) থাকায় খাদ্যমণ্ড নাসাছিদ্রপথে প্রবেশে বাধা পায়।
- কোমল তালু পার হলেই খাবার গলবিলে এসে পৌঁছায়। গলবিল থেকে দুটি নালি চলে গেছে– একটি শ্বাসনালি (trachea), অন্যটি অন্ননালি (oesophagus)।
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে ছোট উদগত অংশ হিসেবে অবস্থিত তরুণাস্থি নির্মিত এপিগ্লটিস (epiglottis) খাদ্য গলধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখ (laryngeal inlet) ঢেকে দিয়ে খাদ্যকে শ্বাসনালিতে প্রবেশে বাধা দেয়, তাই খাদ্যবস্তু অন্ননালিতে প্রবেশ করে।

রাসায়নিক পরিপাক

শর্করা পরিপাক : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে টায়ালিন ও মল্টেজ (অল্প) নামে শর্করাবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়। এগুলো জটিল শর্করাকে মল্টোজ এবং সামান্য মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় পাকস্থলিতে।

১. জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ। ২. মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

আমিষ পরিপাক : মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম না থাকায় এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা।

স্নেহ পরিপাক : মুখগহ্বরে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম না থাকায় এধরনের খাদ্যের পরিপাকও ঘটেনা।

লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত শর্করা গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

দাঁত ও দন্তসংকেত (Teeth & Dental Formula)

মানুষের মুখবিবরের উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে অবস্থিত অ্যালভিওলাই নামক গর্তে দাঁতগুলো দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। মানুষের দাঁত ডাইফায়োডন্ট (diphyodont) ধরনের কারণ এদের দাঁত দুবার গজায়। দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে বিশটি দুধ দাঁত (milk teeth) গজায়। এগুলো আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই একে একে পড়ে গেলে স্থায়ী দাঁত (permanent teeth) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। আঠারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে সাধারণত দুই চোয়ালে সর্বমোট বত্রিশটি দাঁত পরিলক্ষিত হয়।

দাঁতের প্রকারভেদ

মানুষের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত থাকে। এগুলো হচ্ছে-

i. **কর্তন দাঁত (Incisors) :** প্রতি চোয়ালের সামনের ধারালো ৪টি দাঁত যা খাদ্য কাটা ও ছেঁড়ার কাজে সাহায্য করে।

ii. **ছেদন দাঁত (Canine) :** প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে কর্তন দাঁতের পিছনে একটি করে চোখা দাঁত যা খাদ্য ছেঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

iii. **অগ্রপেষণ দাঁত (Pre-molar) :** প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে ছেদন দাঁতের পিছনে দুটি করে এ ধরনের দাঁত থাকে। এগুলোর উর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। এদের কাজ খাদ্যবস্তু চর্বন ও পেষণ।

iv. **পেষণ দাঁত (Molar) :** প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে অগ্রপেষণ দাঁতের পিছনে তিনটি করে এধরনের দাঁত রয়েছে। এদের উর্ধ্বপ্রান্ত অনেক চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। সর্বশেষ পেষণ দাঁতটি পরে উঠে। একে আক্কেল দাঁত (wisdom teeth) বলে। পেষণ দাঁতও খাদ্যবস্তু চর্বন ও পেষণে সাহায্য করে।

দন্ত সংকেত (Dental Formula)

স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মোট দাঁতের সংখ্যা ও ধরণ যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে দন্ত সংকেত বা ডেন্টাল ফর্মুলা বলে। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মানুষের প্রত্যেক চোয়ালের দন্তকোটরে ১৬টি দাঁত থাকে। চোয়ালের সামনে ৪টি কর্তন (incisor), এগুলোর দুপাশে ১টি করে ছেদন (canine), ছেদনের পাশে দুটি করে অগ্রপেষণ (pre-molar) এবং চোয়ালের দুপ্রান্তে রয়েছে ৩টি করে পেষণ দাঁত (molar)।

একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কটি আছে তা লেখা হয়। এর পর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ সংকেত অনুযায়ী মানুষের দন্ত সংকেত:

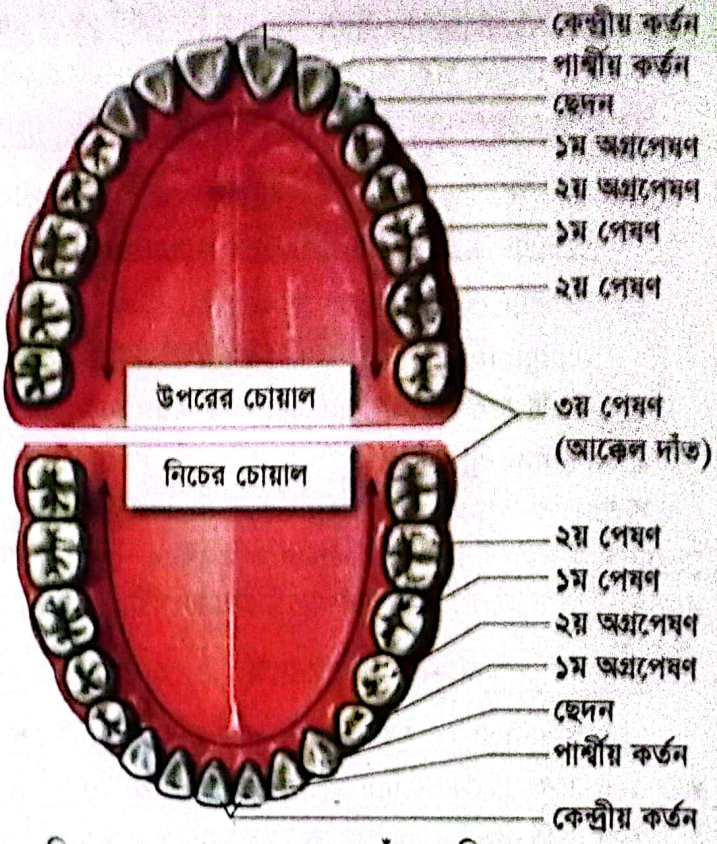

চিত্র ৩. ৪ : মানুষের চোয়ালে দাঁতের বিন্যাস

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$$

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Stomach)

পাকস্থলিটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর দেহে পাকস্থলির ধারণ ক্ষমতা থাকে ৩০ মিলিলিটার (১ আউন্স), বয়ঃসন্ধিকালে হয় ১ লিটার, আর প্রাপ্ত বয়স্কে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৫–২ লিটার। পাকস্থলি নিম্নোক্ত কয়েকটি অংশে বিভক্ত–

i. যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা কার্ডিয়া (cardia)।

ii. কার্ডিয়ার বাম পাশে পাকস্থলি-প্রাচীর যা গম্বুজাকার ধারণ করে তা ফানডাস (fundus)।

iii. ডান অবতল ও বাম উত্তল কিনারা যথাক্রমে ছোট ও বড় বাঁক (lesser and greater curvatures)।

iv. যে অংশটি ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়েছে তা পাইলোরাস (pylorus)।

কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অংশে একটি করে বৃত্তাকার পেশিবলয় আছে। বলয়দুটিকে যথাক্রমে **কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক স্ফিংক্টার** বলে।

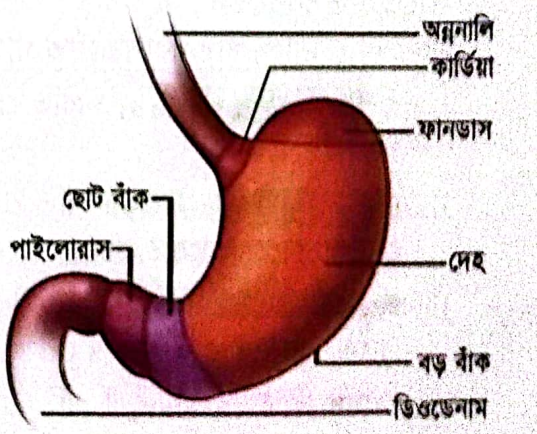

চিত্র ৩.৫ : পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলিতে এসে ২-৬ ঘন্টাকাল অবস্থান করে।
- এসময় প্যারাইটাল কোষ থেকে HCl ক্ষরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়।
- মসৃণ পেশির ৩টি স্তর নিয়ে পাকস্থলি গঠিত। পেশিস্তর বিভিন্ন দিকমুখি হওয়ায় পাকস্থলি প্রাচীর নানাদিকে সঞ্চালিত হয়ে (মোচড় দিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে কিংবা চাপা হয়ে) মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পিষে পেস্ট (paste)-এ পরিণত করে।
- এসময় গ্যাস্ট্রিক জুস (gastric juice) ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলির যান্ত্রিক চাপে পিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে মিশে ঘন স্যুপের মতো মিশ্রণে পরিণত হয়। খাদ্যের এ অবস্থা কাইম (chyme) বা মন্ড নামে পরিচিত। এর উপর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইমের পরিপাক কাজ শুরু হয়ে যায়।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলির প্রাচীর পেশিবহুল এবং গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (gastric gland) সমৃদ্ধ। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি ও চার ধরনের কোষে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ আলাদা। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষরণকে গ্যাস্ট্রিক জুস বলে। এর ৯৯.৪৫% পানি। গ্যাস্ট্রিন (gastrin) নামক হরমোন এ জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলি থেকে শর্করাবিশ্লেষী কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না। ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক জুসে পেপসিনোজেন নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম থাকে। নিষ্ক্রিয় এনজাইমটি গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে পেপসিন নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে। এছাড়া পাচকরসের জিলেটিনেজ নামক এনজাইম জিলেটিন (gelatin) নামক আমিষকে আংশিক পরিপাক করে পেপটোন ও পলিপেপটাইড উৎপন্ন করে।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন

২. জিলেটিন $\xrightarrow{\text{জিলেটিনেজ}}$ পেপটোন ও পলিপেপটাইড

স্নেহ পরিপাক : অম্লীয় মাধ্যমে স্নেহ বিশ্লেষকারী এনজাইম কাজ করতে পারে না কিন্তু পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ নামক খুব দুর্বল স্নেহ বিশ্লেষকারী এনজাইম থাকে। লাইপোলাইটিক (স্নেহ বিশ্লেষকারী) এনজাইমের মধ্যে এরা ব্যতিক্রম এ অর্থে যে, এগুলো একমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম। এ এনজাইম কেবল মাখনের চর্বি বা বাটার ফ্যাট (butter fat)-এর উপর কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ বাটার ফ্যাট ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল তৈরি করে।

অর্ধপাচিত এ খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তে অবস্থিত স্ফিংক্টার (sphincter = পেশির বেড়ী যা ছিদ্রপথকে বেষ্টন করে থাকে) পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাকস্থলি নিজেই এনজাইমে পরিপাক হয়ে যায় না। কারণ–

পাকস্থলির সমগ্র অন্তর্গাত্র গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা (এপিথেলিয়াল আবরণ)-য় আবৃত। এ আবরণ HCl, মিউকাস, বিভিন্ন প্রোএনজাইম ও বাইকার্বোনেট ক্ষরণ করে। পাকস্থলি যেন নিজেই হজম হয়ে না যায় সেকারণে নিম্নোক্ত ৪টি প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় :

১. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে নিঃসৃত পুরু মিউকাস স্তর HCl এর আক্রমণ রোধকারী ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।
২. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে ক্ষরিত বাইকার্বনেট প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষার এবং এটি HCl কে প্রশমিত করে।
৩. এনজাইম পেপসিন প্রথমে পেপসিনোজেন নামক প্রোএনজাইম হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। HCl এর সংস্পর্শে এলে এটি সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।

৪. পাকস্থলির অভ্যন্তরস্থ এপেথেলিয়ামের কোষগুলো ঘন সংলগ্ন ও দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় HCl কিছুতেই এপিথেলিয়ামের ক্ষতি করতে পারেনা।

এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলির প্রোটিন নির্মিত অন্তঃপ্রাচীর কখনোই নিজের ক্ষরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তবে *Helicobacter pylori* নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে কিংবা NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drug; ব্যাথানাশক ওষুধ) ধরনের ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলিতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা গ্যাস্ট্রিক আলসার (gastric ulcer) নামে বহুল পরিচিত।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক (Digestion of Food in Small Intestine)

পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে বৃহদন্ত্রের সূচনায় ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার (ileocolic sphincter) পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা, প্যাঁচানো অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা ডিওডেনাম (duodenum), জেজুনাম (jejunum) ও ইলিয়াম (ileum)। ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে "U" আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চমাংশ গঠন করে।

সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে। খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস, যেমন-পিত্তরস (bile), অগ্ন্যাশয় রস (pancreatic juice) ও আন্ত্রিক রস (intestinal juice) ক্রিয়াশীল হয়।

যান্ত্রিক পরিপাক

- আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- ব্রুনার্স গ্রন্থি (Brunner's gland) ও গবলেট কোষ (goblet cell) থেকে মিউকাস উৎপন্ন হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।
- পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসঙ্কোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।
- কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন পিত্তথলির সঙ্কোচন ঘটিয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।
- পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যকে অবদ্রবণের মাধ্যমে (emulsification) সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইম (chyme) অর্ধ-পাচিত শর্করা ও আমিষ এবং প্রায় অপরিপাককৃত স্নেহদ্রব্য নিয়ে গঠিত। কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়।

পিত্তরস অতিমাত্রায় ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইমকে প্রশমিত করে অন্ত্রের অভ্যন্তরে এক ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য ক্ষারীয় মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা পরিপাক

অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত রসে শর্করা পরিপাকের জন্য নিচে বর্ণিত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

১. অ্যামাইলেজ এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ।

২. মল্টেজ এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

আন্ত্রিক রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী নিম্নোক্ত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল থাকে।

১. **আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ** স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

স্টার্চ, ডেক্সট্রিন + H_2O $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন।

২. **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করার আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে মল্টোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

আইসোমল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৩. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

মল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

৪. **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ সৃষ্টি করে।

সুক্রোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

৫. **ল্যাক্টেজ** এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ।

আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. **ট্রিপসিন** এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত এন্টেরোকাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত হয়।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

২. **কাইমোট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পরে ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় এটি সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয়। এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

৩. **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড।

৪. **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৫. **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিবর্তিত করে।

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৬. **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৭. **কোলাজিনেজ** এনজাইম মাছ ও মাংসে বিদ্যমান কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ সরল পেপটাইড।

৮. **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

ইলাস্টিন $\xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}}$ পেপটাইড।

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

পেপসিন ও ট্রিপসিনের মধ্যে পার্থক্য

পেপসিন (Pepsin)	ট্রিপসিন (Trypsin)
১. পাকস্থলীয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পেপটিক কোষ থেকে পেপসিন উৎপন্ন হয়।	১. অগ্ন্যাশয় থেকে ট্রিপসিন উৎপন্ন হয়।
২. পেপসিন পাকস্থলিতে নিঃসৃত হয়।	২. ট্রিপসিন ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে নিঃসৃত হয়।
৩. এটি প্রথমে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং পরে পাকস্থলীয় HCl এর সংস্পর্শে সক্রিয় পেপসিন-এ পরিণত হয়।	৩. এটি প্রথমে নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং পরে ডিওডেনামের এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের সংস্পর্শে সক্রিয় ট্রিপসিন-এ পরিণত হয়।
৪. এটি পাকস্থলিতে প্রোটিনকে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে।	৪. এটি ডিওডেনামে প্রোটিওজ ও পেপটোনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে **পিত্তরস** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ, যেমন- **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate), **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate), **পটাসিয়াম গ্লাইকোলেট** (potasium glycolate) ও **পটাসিয়াম টরোকোলেট** (potasium taurocholate) স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম স্নেহকণা পরিপাকে নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. **লাইপেজ** নামের এনজাইম স্নেহকণাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত করে।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

২. **ফসফোলাইপেজ** এনজাইম ফসফোলিপিডকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফোরিক এসিডে পরিণত করে।

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড।

৩. **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে।

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + কোলেস্টেরল।

আন্ত্রিক রসে নিম্নলিখিত স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়।

১. **লাইপেজ** এনজাইম পিত্তলবণের প্রভাবে স্নেহকণায় পরিণত হওয়া লিপিডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। পরে তা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড।

২. **লেসিথিনেজ** এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, ফসফোরিক এসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড + কোলিন।

৩. মনোগ্লিসারাইডেজ কোষের ভিতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিবর্তিত করে।

মনোগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\text{মনোগ্লিসারাইডেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

এছাড়াও আন্ত্রিক গ্রন্থির নিউক্লিয়েডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ ও নিউক্লিওসাইডেজ এনজাইমসমূহ নিউক্লিক এসিড ও এর উপাদানগুলোকে ফসফেট গ্রুপ, পেন্টোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেন বেস-এ বিশ্লিষ্ট করে।

পরিপাক গ্রন্থির ভূমিকা (Role of Digestive Glands)

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন রস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে সেগুলোকে পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি রয়েছে, যথা- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। নিচে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. লালা গ্রন্থি (Salivary Glands)

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া লালা গ্রন্থি বিদ্যমান। লালা গ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়াম আবৃত গোলাকার বা ডিম্বাকার রসনিঃসারী অসংখ্য থলি নিয়ে গঠিত। থলির প্রাচীরে **সেরাস কোষ** ও **মিউকাস কোষ** থাকে। প্রতিটি থলি থেকে একটি নালি বের হয়ে লালা গ্রন্থির মূল নালিতে যুক্ত হয়। মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে নিচে বর্ণিত তিনজোড়া লালা গ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে –

ক. প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland) : এগুলো সবচেয়ে বড় লালা গ্রন্থি। প্রতি কানের নিচে রয়েছে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি। প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে একটি নালি বেরিয়ে দ্বিতীয় উর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে মুখবিবরে উন্মুক্ত হয়।

খ. সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular gland) : প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি অবস্থিত। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে ফ্রেনুলাম (frenulum) নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

গ. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual gland) : জিহ্বার নিচে অবস্থান করে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি। গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে ফ্রেনুলামে উন্মুক্ত হয়।

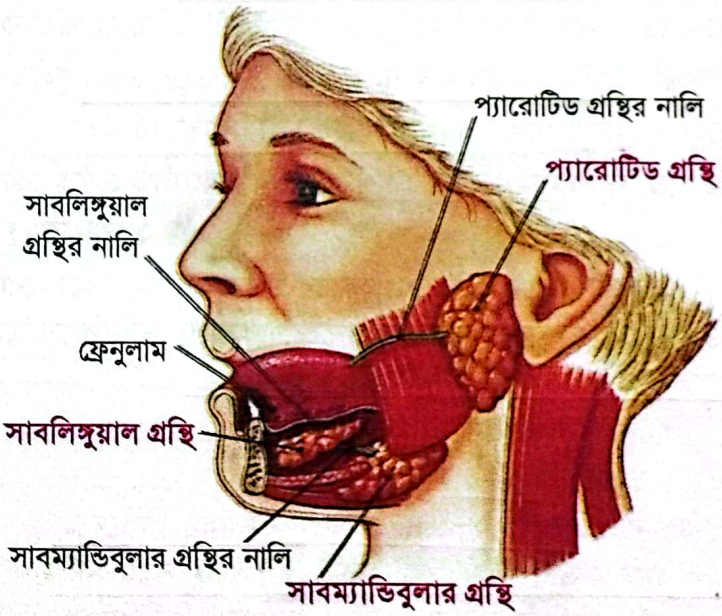

চিত্র ৩.৬ : মানুষের লালা গ্রন্থিসমূহ

লালা (Saliva)

লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **লালা** বা **লালা রস** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ১২০০ - ১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা সামান্য অম্লীয়, ফলে মুখগহ্বরে সবসময় pH 6.2-7.4 মাত্রায় আম্লিক অবস্থা বিরাজ করে।

লালার উপাদান (Composition of saliva)

১. পানি: ৯৫.৫% – ৯৯.৫%।
২. কোষীয় উপাদান : ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।
৩. গ্যাস : প্রতি ১০০ মিলি লালায় ১ মিলি অক্সিজেন, ২৫ মিলি নাইট্রোজেন এবং ৫০ মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৪. **অজৈব পদার্থ :** প্রায় ০.২%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

৫. **জৈব পদার্থ:** প্রায় ০.৩%; এনজাইম (টায়ালিন, লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিও -লাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

লালার কাজ (Functions of saliva)

১. লালার অধিকাংশই পানি। খাদ্যের স্বাদ অনুভব এবং পরিপাকের সময় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পানি খাদ্যের দ্রাবক হিসেবে খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম করে। পানি মুখ অভ্যন্তরকেও সিক্ত করে, ফলে স্বাদ অনুভবসহ খাদ্য চিবানো ও গিলতে সুবিধা হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়িগুলো শুকনো খাদ্যে প্রভাবিত হয় না। লালায় ভিজে খাদ্যকণা মুক্ত হলে তা থেকে স্বাদকুঁড়িগুলো অনুভূতি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ উপলব্ধি সম্ভব হয়।

২. মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁট লালায় সিক্ত থাকায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ হয়। ভয়, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি সময়ে কিংবা অসুখের সময় লালাক্ষরণ কমে যায়। তখন কথা বলতে অসুবিধা হয়। এ অবস্থাকে জেরোস্টোমিয়া (xerostomia) বলে।

৩. মিউসিন নামক গ্লাইকোপ্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল খাদ্যকে দলায় পরিণত করে। লালা খাদ্য চর্বণ ও গলাধঃকরণে সহায়ক। অম্ল ও ক্ষারকে প্রশমন (বাফার) করতেও এটি সাহায্য করে।

৪. ক্লোরাইড (Chloride) স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে সক্রিয় করে।

৫. স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন এনজাইম (Salivary amylase or Ptyaline) রান্না করা স্টার্চের পলিস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে মলটোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।

৬. বাইকার্বনেট (Bicarbonate) লালার অম্লতা pH 6.2 – 7.4 এর মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি বাফার (buffer) হিসেবে কাজ করে। ফলে মুখে সৃষ্ট এসিডের শক্তি কমিয়ে রাখার মাধ্যমে দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে।

৭. লাইসোজাইম এনজাইম (Lysozyme enzyme) গৃহীত খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করে।

৮. লালা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ।

৯. লালা সামগ্রিকভাবে মুখ অভ্যন্তর এবং দাঁত থেকে কোষীয় ও খাদ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে।

২. যকৃত (Liver)

অবস্থান : যকৃত উদর-গহ্বরের উপরভাগে ডানদিকে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলির ডান পাশে অবস্থিত। এটি একটি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে এবং দেখতে লালচে-বাদামি রঙের।

গঠন : যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষে এর ওজন প্রায় ১.৪–১.৮ কেজি; নারিদেহে ১.২–১.৪ কেজি; সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুদেহে ১৫০ গ্রাম। ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কডেট নামে ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। খণ্ডগুলো স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ ক্যাপসুলে আবৃত। ডান খণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের নিচের পিঠে পিত্তথলি (gall bladder) সংলগ্ন থাকে। যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম যকৃত নালি মিলে একটি অভিন্ন যকৃত নালি গঠন করে। এটি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন পিত্তনালি গঠন করে যা অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার (ampulla of vater) নামে নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

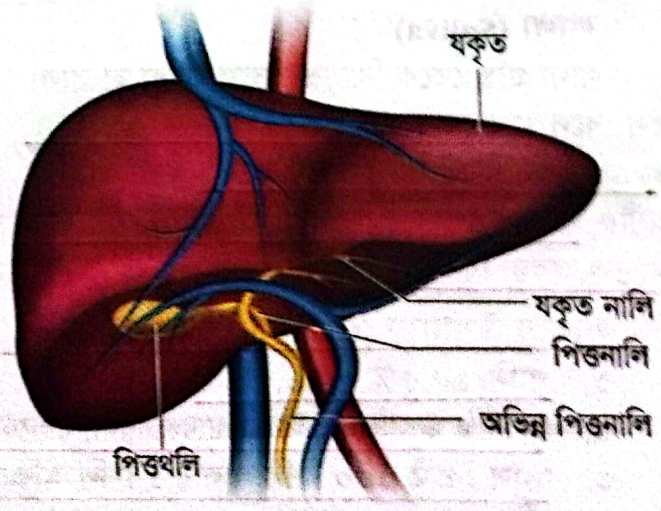

চিত্র ৩.৭ ▸মানুষের যকৃত

যকৃতের আণুবীক্ষণিক গঠন : আণুবীক্ষণিক গঠনে দেখা যায় যকৃত **গ্লিসন ক্যাপসুল** (Glisson's capsule) নামক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **যকৃত লোবিউল** (hepatic lobule) নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। লোবিউলগুলো ৫ বা ৬ বাহুবিশিষ্ট, বহুভূজাকার। অধিকাংশ লোবিউল ১ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। প্রতিটি লোবিউলের অন্তর্ভাগে অসংখ্য বহুভূজাকার **হেপাটিক কোষ** বা **হেপাটোসাইট** থাকে। লোবিউলের কেন্দ্রে একটি করে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein) থাকে। লোবিউলের মাঝে রক্ত চলাচলের জন্য **সাইনুসয়েড** (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে। সাইনুসয়েডগুলো **কাপফার কোষ** (kupffer's cell) দিয়ে আবৃত। এসব কোষ লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অণুজীব এবং বহিরাগত কণাকে গলাঃকরণ করে। দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক টিস্যু পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিত্তনালির শাখা থাকে।

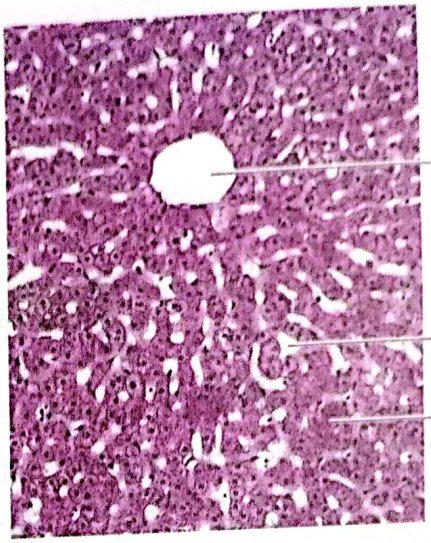

চিত্র ৩.৮ : যকৃত লোবিউলের অনুচ্ছেদ

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage & Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত যা দেহের ওজনের প্রায় ৩–৫%। এটি মূলত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতি বা সাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যকৃতে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক (bio-chemical) বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে দেহের **বিপাক** (metabolism) ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে একে মানবদেহের **জৈব রসায়নাগার** (organic laboratory) বলা হয়। এখানে প্রায় পাঁচ শতাধিক জৈবনিক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage functions of Liver)

যকৃত দেহের প্রধান সঞ্চয় কেন্দ্র। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পরিশোষিত সরল খাদ্যোপাদানসমূহ পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে। এখানে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান স্বরূপে বা পরিবর্তিতরূপে সঞ্চিত হয়। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. **গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) :** ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় **গ্লাইকোজেন**-এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। **ইনসুলিন** (insulin) নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক রাখে।

২. **রক্ত সঞ্চয় (Blood Reservoir) :** প্লীহা ও অন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তবাহিকাগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভিতর দিয়ে রক্ত যদিও অনবরত প্রবাহিত হয় তারপরও এর রক্তবাহিকাগুলোসহ এ শিরা বিপুল পরিমাণ রক্তের **ভান্ডার** (reservoir) হিসেবে কাজ করে। যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে যা দেহের বিভিন্ন রক্তক্ষরণজনিত ঘটনায় মূল রক্তসংবহনের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপের সমন্বয় ঘটায়।

৩. **ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamins) :** যকৃত স্নেহে (fat) দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C), সায়ানো কোবালামিন (B_{12}) এবং ফলিক এসিড সঞ্চয় করে। B_{12} এবং ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়।

৪. **পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of Bile) :** যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে যা খাদ্য পরিপাকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

৫. চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat & Amino acid) : যে শর্করা (গ্লুকোজ) দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না বা গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে না, যকৃত সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে। যকৃত অ্যামিনো এসিডও জমা রাখে। দেহের প্রয়োজনে চর্বি এবং অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

৬. মিনারেল সঞ্চয় (Storage of Mineral) : যকৃত লৌহ ও পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙনে হিমোগ্লোবিন যকৃতের কাপফার (Kupffer) কোষের মাধ্যমে ভেঙ্গে হিম (haem) ও গ্লোবিন (globin)-এ পরিণত হয়। হিমের লৌহ অংশ ফেরিটিন (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থাকে। এছাড়াও কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট ইত্যাদি মিনারেল স্বল্পমাত্রায় যকৃতে সঞ্চিত থাকে।

যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic functions of Liver)

যকৃত দেহের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রধান অঙ্গ। এতে নানা ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা দেহের বিপাক ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যকৃত শর্করা, আমিষ ও স্নেহবস্তু বিপাকের প্রধান স্থান। যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়।

১. শর্করা বিপাক (Carbohydrate Metabolism) : শর্করা বিপাকে যকৃতের ভূমিকাই মুখ্য। যকৃতে শর্করার বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

- **গ্লাইকোজেনেসিস** (Glycogenesis) : অন্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে চিনি (যেমন–গ্লুকোজ) যকৃতে প্রবেশ করে। এ শিরাটি বিভিন্ন মাত্রায় চিনি বহনকারী একমাত্র রক্তবাহিকা। শর্করা বিপাকে যকৃতই দেহে গ্লুকোজ মাত্রা প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ৯০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধরনের খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা যেন না বাড়ে বা কমে, যকৃত তা প্রতিরোধ করে। গ্যালাক্টোজ, ফ্রুক্টোজসহ সমস্ত হেক্সোজ শর্করাকে যকৃত গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে **গ্লাইকোজেন** (glycogen) নামক অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড হিসেবে জমা রাখে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে। প্রক্রিয়াটি ইনসুলিনের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হয়। ইনসুলিন (insulin) হচ্ছে রক্তে চিনির লেভেল বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন।
- **গ্লুকোনিয়োজেনেসিস** (Gluconeogenesis) : যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অশর্করা জাতীয় উপাদান থেকে গ্লুকোজ শর্করা উৎপন্ন হয়, তাকে **গ্লুকোনিয়োজেনেসিস** বলে। এটি শর্করার উপচিতিমূলক বিপাক। এটি প্রধানত যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। দেহের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অত্যধিক কমে গেলে যকৃত অ্যামিনো এসিড, ল্যাকটিক এসিড, পাইরুভিক এসিড, গ্লিসারল ইত্যাদি অশর্করা জাতীয় উপাদান থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে রক্তে প্রেরণ করে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে। এ প্রক্রিয়াটি **গ্লুকাগন** হরমোন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এভাবে যকৃত রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা ৯০ মিলিগ্রাম/১০০ ঘন সেন্টিমিটার বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** (Glycogenolysis) : রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়। এ প্রক্রিয়াটি এপিনেফ্রিন ও গ্লুকাগন হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- **লাইপোজেনেসিস** (Lipogenesis) : রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে তা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride = TG)-এ রূপান্তর করে। এ ট্রাইগ্লিসারাইড কোষে চর্বি হিসেবে সঞ্চিত হয়। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্য খেলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) মাত্রা বেড়ে যায় যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর।

গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিসের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	গ্লাইকোজেনেসিস	গ্লাইকোজেনোলাইসিস
১. প্রকৃতি	এ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয়।
২. ক্রিয়াস্থল	যকৃতে।	মাংসপেশি ও যকৃতে।
৩. প্রভাবক	ইনসুলিন।	গ্লুকাগন।
৪. গুরুত্ব	রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায় বা ভারসাম্য বজায় রাখে।	রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে (শর্করা কমে গেলে)।

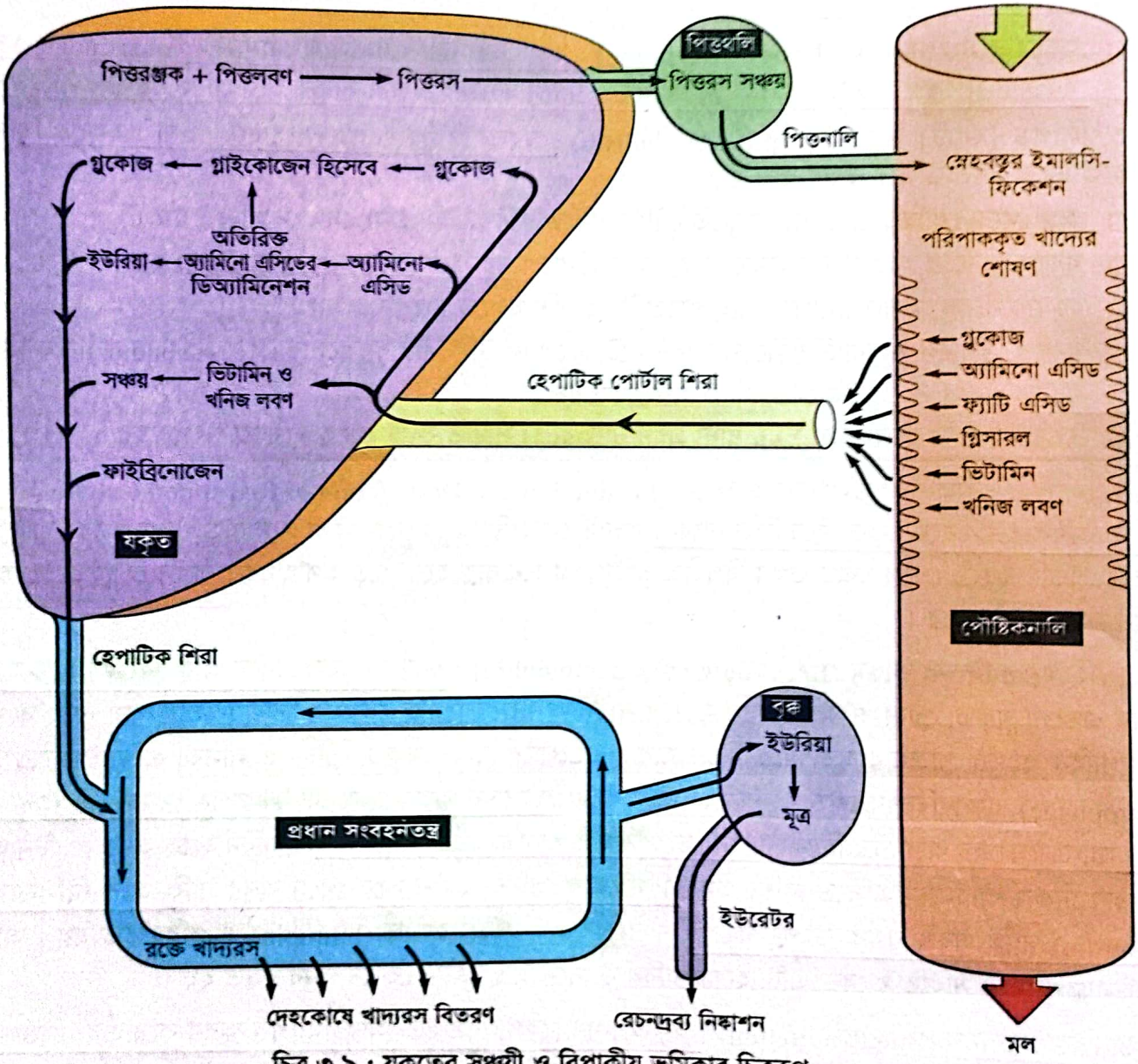

চিত্র ৩.৯ : যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার চিত্ররূপ

২. প্রোটিন বিপাক (Protein Metabolism) : প্রোটিন বিপাকে যকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব ভূমিকাকে নিচে বর্ণিত শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **ডিঅ্যামিনেশন (Deamination) :** কোন অ্যামিনো এসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণ প্রক্রিয়াকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহ জমিয়ে রাখতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন

মূলক ($-NH_2$) তৈরি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করে।

- **ইউরিয়া তৈরি (Urea Formation) :** অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ যা দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে অরনিথিন চক্রে (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ইউরিয়া সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ক থেকে মূত্ররূপে দেহ নির্গত হয়।
- **প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Synthesis of Plasma Proteins) :** যকৃত γ গ্লোবিউলিন ছাড়া প্রায় সকল ধরনের প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হচ্ছে: অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, ∞ ফিটোপ্রোটিন এবং রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টর I, II, V, VII, IX, X, XI, XII.
- **হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of Hormone) :** যকৃত অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত রেনিন (renin) এনজাইম দ্বারা সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৩. লিপিড (ফ্যাট) বিপাক (Lipid Metabolism) : যকৃত লিপিড বিপাকের প্রধান কেন্দ্র। যকৃতে লিপিডের বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে বর্ণনা করা যায় :

- অন্ত্র থেকে শোষিত স্নেহপদার্থ যকৃতে পৌঁছে চর্বিতে পরিণত হয় এবং সেখানে সঞ্চিত হয়।
- যকৃতে ফ্যাটের অক্সিজেন সংযোগে দহন বা অক্সিডেশনের ফলে ATPরূপে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, লাইপোপ্রোটিন প্রভৃতি যকৃতে সংশ্লেষিত হয়।
- যকৃতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণ ঘটে, ফলে কিটোনবর্গীয় বস্তুগুলোর (Ketone bodies) উৎপত্তি হয়।
- যকৃতে শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাট সংশ্লেষিত হয়।
- শর্করার অভাব হলে (দীর্ঘ সময় খাদ্য গ্রহণ না করলে) সঞ্চিত ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

৪. লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও ভাঙন (Production and Destruction of Red Blood Cells) : ভ্রূণদেহে লোহিত কণিকা উৎপাদনে যকৃত নিয়োজিত থাকে। পরবর্তীতে অস্থিমজ্জার কোষগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। এ প্রক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যকৃত তখন বিপরীত ভূমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যকৃত তখন লোহিত রক্তকণিকা ভাঙনে সহযোগিতা করে।

৫. হিমোগ্লোবিনের ভাঙন (Breakdown of Haemoglobin) : লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)। এরপর এগুলো যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় ফ্যাগোসাইটিক ম্যাক্রোফেজ কোষের ক্রিয়ায় ভেঙে যায় এবং কণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের প্লাজমায় মুক্ত হয়ে মিশে যায়। এগুলোকে তখন যকৃত, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির ম্যাক্রোফেজ (macrophage) নামক বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা গ্রহণ করে। যকৃতের ম্যাক্রোফেজকে কাপফার কোষ (Kupffer cell) বলে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে হিম ও গ্লোবিন-এ পরিণত হয়। গ্লোবিন হচ্ছে অণুর প্রোটিন অংশ, এটি তার নিজস্ব অ্যামিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। হিম থেকে আয়রন অংশ সরে গেলে অণুর বাকি অংশ বিলিভারডিন (biliverdin) নামে সবুজ রঞ্জক উৎপন্ন করে। এ রঞ্জক হলদে বিলিরুবিন (bilirubin)-এ পরিবর্তিত হয়। আয়রন ফেরিটিনরূপে দেহে সঞ্চিত থাকে। এটি হিমোগ্লোবিন উৎপন্নে অস্থিমজ্জার কোষে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

৬. পিত্ত উৎপাদন (Bile Production) : যকৃত কোষ (হেপাটোসাইট) অবিরাম পিত্ত ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃত কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ, যেমন–সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৭. হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of Hormone) : যকৃত অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত রেনিন (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৮. হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormones) : যকৃত প্রায় সব হরমোনই কম-বেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যত দ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন প্রভৃতি) তত দ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃত বিভিন্ন হরমোনের কর্মকান্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

৯. টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভিতর স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন পদার্থকে **টক্সিন** (toxin) বা **বিষ** বলে। যকৃত কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ বিষ প্রশমিত হয়ে যায়। অনেক ওষুধও দেহ থেকে অপসারণ করে।

১০. তাপ উৎপাদন (Production of Heat) : যকৃতের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় এখানে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়। এ তাপ রক্তবাহিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়, ফলে দেহে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে (homeotherm) অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না।

১১. রক্ত ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখা (Blood Cleansing Function) : পোর্টাল শিরা যখন যকৃতে প্রবেশ করে তখন যকৃতের **কাপফার কোষ** (Kupffer Cells) গুলো পোর্টাল শিরা মধ্যস্থ রক্তের ব্যাকটেরিয়াগুলো ধ্বংশ করে। ফলে সিস্টেমিক সংবহনে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারে না।

যকৃতের নিঃসরণ– পিত্তরস (Secretion of Liver — Bile)

পিত্তরস (Bile) বা পিত্ত : যকৃত কোষ থেকে নিঃসৃত পিত্তরস হলদে-সবুজ, আঠালো, তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় তরল (pH 8 - 8.6) পদার্থ। পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে বাম ও ডান যকৃতনালি পথে অভিন্ন যকৃতনালিতে আসে এবং সিস্টিকনালি দিয়ে পিত্তথলিতে জমা হয়। অভিন্ন যকৃতনালি ও সিস্টিকনালি মিলিত হয়ে অভিন্ন পিত্তনালি (common bile duct) তৈরি করে যা অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার (ampulla of vater)-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

উপাদান : পিত্তরস যেসব উপাদানে গঠিত তা হচ্ছে–

i. **পানি** (৯৭% – ৯৮%)।
ii. **অজৈব লবণ** (সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বনেট ও ফসফেট–০.৮%)।
iii. **পিত্তলবণ** (সোডিয়াম টোরোকলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট–০.৮%)।
iv. **পিত্ত রঞ্জক** (বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন–০.২%)।
v. **কোলেস্টেরল** (০.৩৮%) এবং
vi. **ফ্যাট** (০.৮%)।

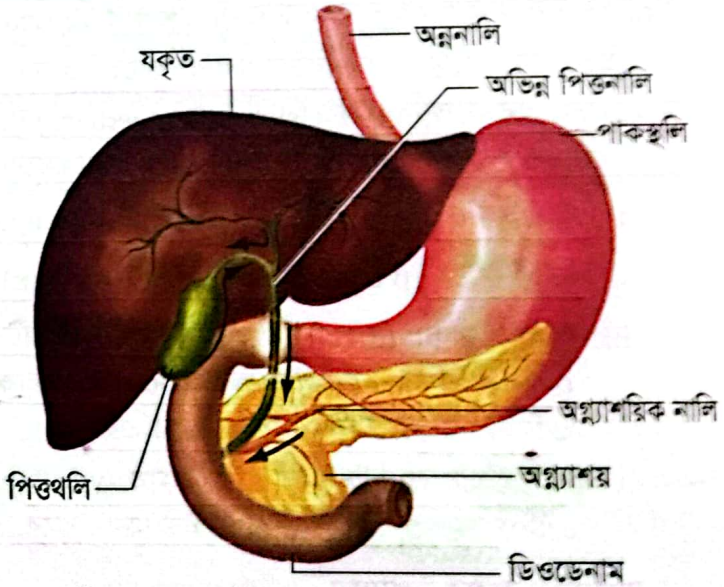

চিত্র ৩.১০ : পৌষ্টিকতন্ত্রে প্রধান কয়েকটি অঙ্গের অবস্থান

পিত্তরসের কাজ

১. পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ইমালসিফিকেশন (emulsification) প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।
২. পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।
৩. পিত্তরস মাইসেলি (micelles) তৈরির মাধ্যমে চর্বিজাতীয় খাদ্যসার শোষণে সহায়তা করে।
৪. পিত্তলবণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K-কে শোষণে সহায়তা করে।
৫. পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিংক, পারদ, টক্সিন জাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়।
৬. পিত্তরসে বেশি ক্ষারক পদার্থের উপস্থিতির জন্য HCl কে প্রশমিত করে pH নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে আগত অম্লীয় কাইমকে প্রশমিত করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।
৭. পিত্তলবণ কোলনে পেরিস্ট্যালসিস (colon peristalsis) বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুন্ডলীর ফাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বাটে আকৃতির (মরিচের মতো) গোলাপী-ধূসর বর্ণের মাংসল একটি গ্রন্থি।

গঠন : অগ্ন্যাশয় ১২–১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি মিশ্র গ্রন্থি (mixed gland)। এর চওড়া যে দিকটি ডিওডেনামের কুন্ডলির ফাঁকে থাকে তার নাম মাথা; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি লেজ; এবং মাথা ও লেজের মাঝের অংশকে দেহ বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয় এবং উইর্সাং নালি (duct of Wirsung) গঠন করে। এ নালি গ্রন্থির দৈর্ঘ্য বরাবর এসে ডিওডেনামের কাছে অভিন্ন পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার (ampulla of Vater) -এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

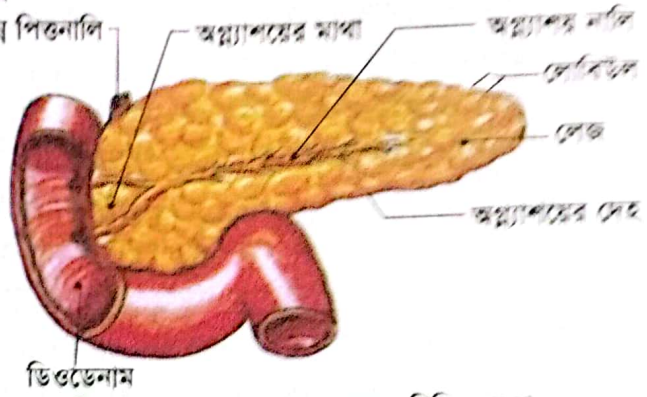

চিত্র ৩.১১ : মানুষের অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন অংশ

অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য এটি একটি মিশ্র গ্রন্থি।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ে অসংখ্য লোবিউল (lobule) বা অ্যাসিনাস (acinus) থাকে। প্রতিটি লোবিউল একটি কেন্দ্রীয় লুমেন (ক্ষুদ্র নালি) এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। লোবিউলের কোষ থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। লুমেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকা। সকল অ্যাসিনাসের লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি বা উইর্সাং নালি গঠন করে।

লোবিউল বা অ্যাসিনাস নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে সনাল গ্রন্থি বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালির মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় রস বাহিত হয় বলে এদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (exocrine gland) বলা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : লোবিউলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু বহুভুজাকার কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans) বা ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ বলে। এতে ৪ ধরনের কোষ পাওয়া যায়। কোষগুলো নালিবিহীন এবং এসব কোষগুলো থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়। কোষগুলো হচ্ছে :

i. আলফা কোষ (α cell) : এটি গ্লুকাগন (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

ii. বিটা কোষ (β cell) : এটি ইনসুলিন (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়।

iii. ডেল্টা কোষ (δ cell) : এটি সোমাটোস্টাটিন (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে, যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং

iv. পিপি কোষ (PP cell) বা গামা কোষ (γ cells) : এটি প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

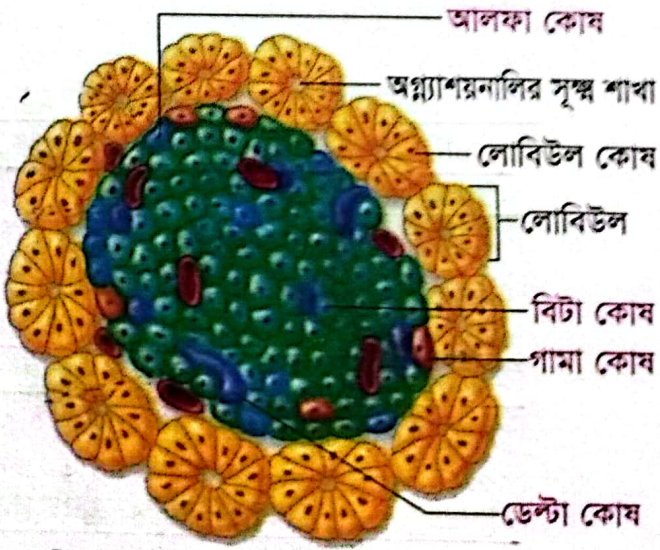

চিত্র ৩.১২ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ

অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

১. পানি : ৯৮%।

২. জৈব বস্তু : ১.৮%–ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম।

৩. অজৈব বস্তু : ০.২%–সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কের বাইকার্বনেট লবণ ইত্যাদি।

পরিপাকে অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা

খাদ্য পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যাওয়ার সময় ক্ষারীয় তরলরূপী ($p^H 8 - 8.3$) অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে দুধরনের ক্ষরণ মিলে অগ্ন্যাশয় রস গঠন করে, যেমন– পরিপাক এনজাইম এবং একটি ক্ষারীয় তরল। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপাককারী এনজাইম নিঃসৃত হয়। আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এসব এনজাইমসমূহের পরিপাকে অংশগ্রহণের ধরন নিম্নরূপ:

শর্করা পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।
- **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **ট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
- **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেটাইডে পরিণত করে।
- **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।
- **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **লাইপেজ** এনজাইম চর্বি (লিপিড)-কে ভেঙে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল-এ বিশ্লিষ্ট করে।

পরিপাক সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও অগ্নাশয় রস যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে তা হলো–

১. অগ্ন্যাশয় রস অম্লক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
২. অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারীয় হওয়ায় ডিওডেনামে পাকস্থলি থেকে আগত তীব্র আম্লিক কাইম (পাকমণ্ড) ক্ষারীয় মাধ্যমে নিরপেক্ষ হয়, ফলে এনজাইমের কার্যকারিতায় খাদ্যবস্তুর পরিপাক সম্পূর্ণ হয়।
৩. অগ্ন্যাশয় রস দেহে পানির সাম্য রক্ষা করে।
৪. অগ্ন্যাশয় রস দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands)

পাকস্থলি (stomach) একটি থলিসদৃশ অঙ্গ এবং এর প্রাচীর **পেশি** ও **মিউকোসা** (mucosa) দিয়ে গঠিত। মিউকোসা স্তরটি সরল স্তম্ভাকার এপিথেলিয়ামে (columnar epithelium) আবৃত যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন গ্যাস্ট্রিক পিট (gastric pit) সম্পন্ন। গ্যাস্ট্রিক পিট গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ধারণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ পৃথক। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ–

১. **অক্সিনটিক কোষ (Oxyntic cell) :** এগুলো প্যারাইটাল কোষ (parietal cell)-নামে পরিচিত এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর উৎপন্ন করে।

২. **মিউকাস কোষ (Mucous cell) :** এসব কোষ পিচ্ছিল ক্ষারীয় মিউকাস উৎপন্ন করে।

৩. **আর্জেন্টাফিন কোষ (Argentaffin cell) :** দানাদার এসব কোষ সেরোটনিন (serotonin) নিঃসৃত করে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত বলয়াকার পেশিগুলোর ছন্দোময় সঙ্কোচন প্রবাহ বা পেরিসট্যালসিস নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **জাইমোজেনিক কোষ (Zymogenic cell) :** জাইমোজেনিক কোষকে চীফ কোষ (chief cell)-ও বলে। এ কোষ থেকে পেপসিনোজেন উৎপন্ন হয়।

গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদান

i. পানি : ৯৯.৪৫% ।

ii. অজৈব পদার্থ : ০.১৫%; HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি ।

iii. জৈব পদার্থ : ০.৪০%; মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর; এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ ইত্যাদি) ।

গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ

১. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে ।

২. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান **পেপসিন** এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে ।

৩. গ্যাস্ট্রিক জুস পাকস্থলির প্রাচীর সুরক্ষা করে ।

৪. কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালকোলয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয় ।

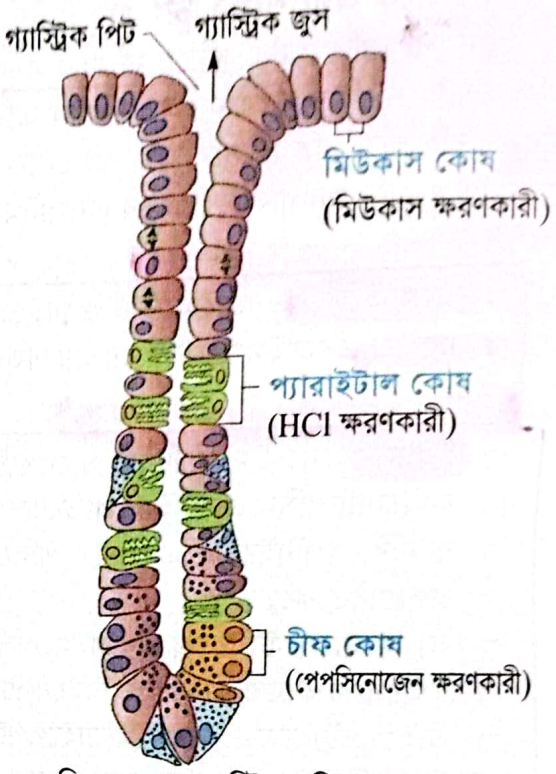

চিত্র ৩.১৩ : গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিসমূহ

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal Glands)

অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে । এগুলো হচ্ছে– শোষণক্ষম কোষ, গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, আর্জেন্টাফিন কোষ, লিবারক্যুন-এর গ্রন্থি এবং ব্রুনার-এর গ্রন্থি । এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস ইন্টেরিকাস** (intestinal juice or succus entericus) বলে ।

আন্ত্রিক রসের উপাদান

i. পানি: ৯৮.৫% ।

ii. অজৈব পদার্থ : ০.৮%; **সোডিয়াম**, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ ।

iii. জৈব পদার্থ : ০.৭%; **সক্রিয়ক**– এন্টেরোকাইনেজ; **এনজাইম**– ট্রিপসিনোজেন, পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ, লাইপেজ ইত্যাদি ।

আন্ত্রিক রসের কাজ

১. আন্ত্রিক রসের **মিউকাস** অন্ত্র প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে ।

২. এতে উপস্থিত সক্রিয়ক **এন্টেরোকাইনেজ** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে ।

৩. এ রসের **সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ** এনজাইম যথাক্রমে, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে ।

৪. এতে অবস্থিত পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে ।

চিত্র ৩.১৪ : আন্ত্রিক গ্রন্থিসমূহ

মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

মুখগহ্বর
- খাদ্যকে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করে।

লালাগ্রন্থি
- খাদ্যকে নরম ও পিচ্ছিল করে।
- টায়ালিন ও মল্টেজ শর্করার ভাঙ্গন ঘটায়।

গলবিল
- খাবারকে মুখগহ্বর থেকে অন্ননালিতে পৌঁছে দেয়।

অন্ননালি
- এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে পৌঁছে।

যকৃত
- বিভিন্ন জৈব অণুর ভাঙ্গন ও গড়ন ঘটায়।
- ভিটামিন ও আয়রণ সঞ্চয় করে।
- পুরোনো রক্ত কণিকা ধ্বংস করে।
- বিষ অপসারণ করে।
- পিত্তরস উৎপন্ন করে।

পাকস্থলি
- খাদ্যবস্তু সাময়িকভাবে জমা রাখে।
- **পেপসিন** এনজাইম প্রোটিনের ভাঙ্গন ঘটায়।
- HCl নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে এবং খাদ্যবাহিত জীবাণু ধ্বংস করে।
- **মিউকাস** পাকস্থলির প্রাচীরকে রক্ষা করে।
- অল্প পরিশোষণ ঘটে।

পিত্তথলি
- পিত্তরস জমা রাখে।

ক্ষুদ্রান্ত্র
- পরিপাক সম্পূর্ণ করে।
- **মিউকাস** অন্ত্রপ্রাচীরকে সুরক্ষা করে।
- খাদ্যরসের পরিশোষণ ঘটে।
- **প্রোটিয়েজ** প্রোটিনের পরিপাক ঘটায়।
- **সুক্রেজ** সুক্রোজ-এর ভাঙ্গন ঘটায়।
- **অ্যামাইলেজ** স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন ভাঙ্গে।
- **পিত্তরস** স্নেহ পরিপাকে সাহায্য করে।
- **লাইপেজ** স্নেহের ভাঙ্গন ঘটায়।
- **নিউক্লিয়েজ** নিউক্লিক এসিডের পরিপাক ঘটায়।

অগ্ন্যাশয়
- রক্তে গ্লুকোজ লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে।
- কাইমকে প্রশমিত করে।
- **ট্রিপসিন** ও **কাইমোট্রিপসিন** প্রোটিনকে ভাঙ্গে।
- **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** প্রোটিন পরিপাক করে।
- **অ্যামাইলেজ** স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনকে পরিপাক করে।
- **লাইপেজ** লিপিড পরিপাক করে।
- **নিউক্লিয়েজ** নিউক্লিক এসিডের পরিপাক ঘটায়।

বৃহদন্ত্র
- পানি, আয়ন ও ভিটামিন শোষণ করে।
- বর্জ্যবস্তু জমা রাখে।

- প্রোটিন পরিপাক
- কার্বোহাইড্রেট পরিপাক
- লিপিড পরিপাক
- নিউক্লিক এসিড পরিপাক

অ্যাপেন্ডিক্স
- ইমিউনতন্ত্রের কোষ বহন করে।

মলাশয়
- বর্জ্যবস্তু (মল) ত্যাগের অপেক্ষায় থাকে।

পায়ু
- মলত্যাগে অংশ নেয়।

চিত্র ৩.১৫ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র

এনজাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	পিত্তরস
১. এনজাইম নালিযুক্ত গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	১. পিত্তরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র তরল পদার্থ।
২. এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	২. পিত্তরসে পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে।
৩. এনজাইম গ্রন্থি থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না।	৩. পিত্তরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে।
৪. এনজাইমের সমগ্র কার্যক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে।	৪. পিত্তরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ।
৫. এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৫. পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে।
৬. এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	৬. পিত্তরস কাজ শেষে বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা (Role of Nervous System & Hormone in Digestion)

মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির উৎস হলো **খাদ্য**। আমরা যে জটিল খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তা দেহকোষের শোষণ উপযোগী করার জন্য আমাদের পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান পরিপাক গ্রন্থি থেকে **এনজাইম** এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে **হরমোন** নিঃসৃত হয়ে জটিল খাদ্যকে সরল ও তরল খাদ্যে পরিণত করে। মানবদেহের প্রধান পরিপাক গ্রন্থিগুলো হলো– **লালা গ্রন্থি, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, যকৃত ও আন্ত্রিক গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থি থেকে পাচক রস নিঃসরণ প্রক্রিয়া স্নায়ু ও হরমোনের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

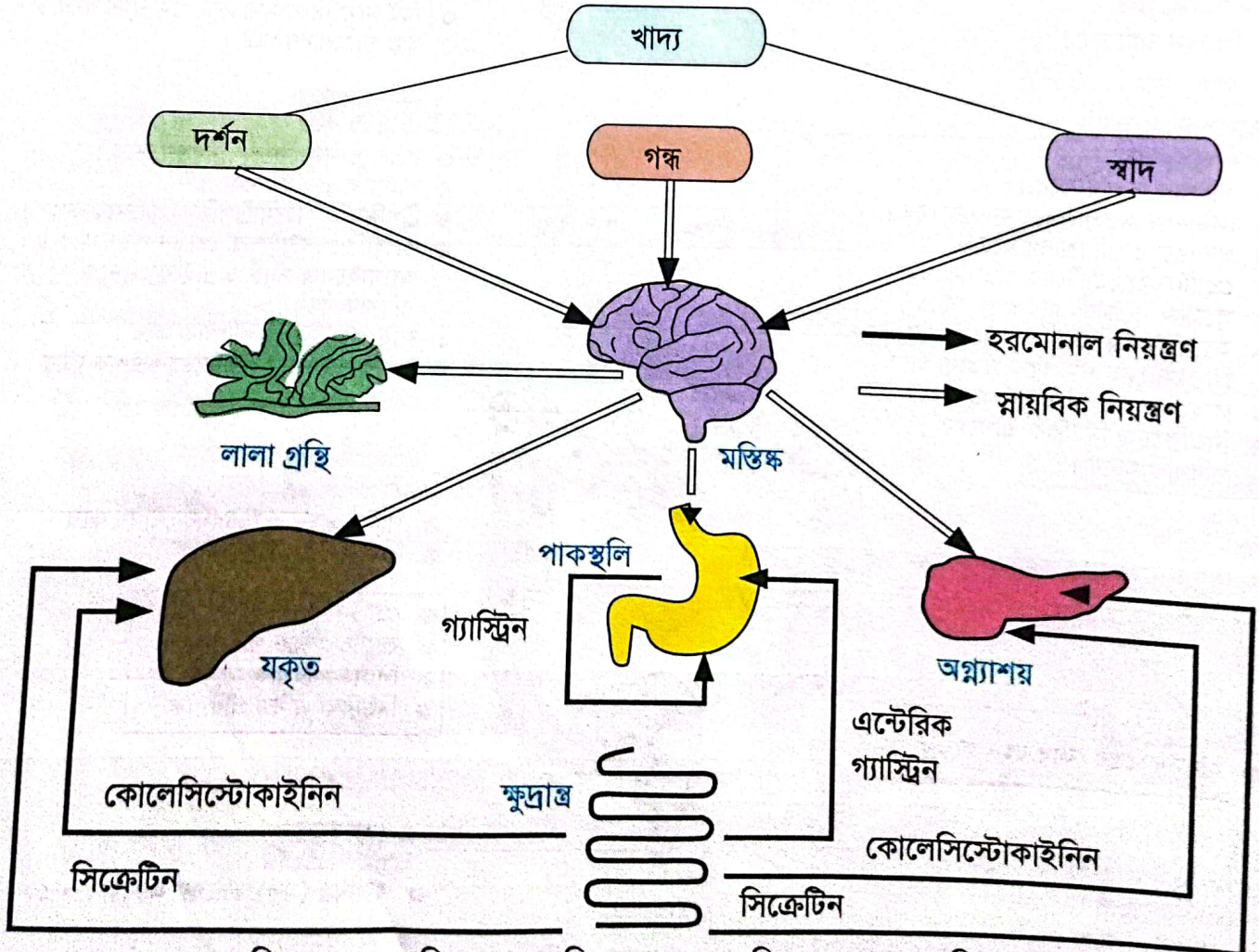

চিত্র ৩.১৬ : পরিপাকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু হরমোনের ভূমিকা

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

১. লালারস ক্ষরণ (Secretion of Saliva) : মুখগহ্বরে অবস্থিত লালা গ্রন্থি থেকে লালারস ক্ষরণ দুধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমটি **সহজাত প্রতিবর্তী** বা **অনপেক্ষ প্রতিবর্তী** (unconditional reflex) – এ ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত স্থির ও কোনো শর্তাধীন নয়। দ্বিতীয়টি **অর্জিত** বা **সাপেক্ষ প্রতিবর্তী** (conditional reflex)–এ ধরনের প্রতিবর্তী জন্মগত নয়, বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

ক. সহজাত প্রতিবর্তী : খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরে প্রবেশের সাথে সাথে সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া শুরু হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়ির স্নায়ুগ্রন্থিগুলো বিভিন্ন ধরনের স্বাদের সংস্পর্শে উদ্দীপ্ত হয়। সংবেদী স্নায়ু এ উদ্দীপনাকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক থেকে উদ্দীপনা চেষ্টীয় বা মোটর স্নায়ুর মাধ্যমে লালা গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং লালারস নিঃসৃত হয়। প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি মস্তিষ্ক হয়ে অতিক্রম করে বলে একে **ক্রেনিয়াল প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (cranial reflex)-ও বলে।

খ. অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী : খাদ্য দেখে, ঘ্রাণ নিয়ে বা মুখে পুরে নেয়ার চিন্তা করলে লালা গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়। এটি অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়া। **বিজ্ঞানী প্যাভলভ** (Pavlov) একটি পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন।

২.গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ (Secretion of Gastric Juice) : গ্যাস্ট্রিক রস নিচে বর্ণিত ৩ পর্যায়ে ক্ষরিত হয়।

ক. স্নায়ু পর্যায় (Nervous phase) বা মস্তিষ্ক দশা (Cephalic Phase) : মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি এবং এর গলাধঃকরণ এক প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা দ্রুত মস্তিষ্কের **ভেগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছে। খাদ্যবস্তু দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ এমনটি চিন্তায় এরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক উদ্দীপনায় **গ্যাস্ট্রিক রস** নিঃসৃত হয়। পাকস্থলিতে খাদ্য পৌঁছার পূর্বে রস নিঃসরণ শুরু হয়। এটা অনেকটা খাদ্যকে গ্রহণ করার পূর্বপ্রস্তুতি। স্নায়ু পর্যায় প্রায় এক ঘন্টা কাল স্থায়ী হয়।

খ. পাকস্থলিয় পর্যায় বা গ্যাস্ট্রিক পর্যায় (Gastric Phase) : এটি পাকস্থলিতে সম্পন্ন হয়। এ সময় স্নায়ু ও হরমোন উভয় সম্পৃক্ত হয়। খাদ্য পাকস্থলিতে পৌঁছালে পাকস্থলির প্রাচীর উদ্দীপ্ত হয় এবং স্নায়বিক উদ্দীপনা সাবমিউকোসা স্তরের **মেসনার'স প্লেক্সাস** (meissener's Plexus)-এ পৌঁছে। ফলে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে উদ্দীপনা পৌঁছালে তা সক্রিয় হয়ে গ্যাস্ট্রিক রসের ক্ষরণ ঘটায়। পাশাপাশি উদ্দীপনা মিউকোসায় অবস্থিত বিশেষ এন্ডোক্রাইন কোষকে **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) হরমোন নিঃসরণের জন্য প্রভাবিত করে। উভয়বিধ ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সমৃদ্ধ **গ্যাস্ট্রিক রস** নিঃসরণ প্রায় চার ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

গ. আন্ত্রিক পর্যায় (Intestinal Phase) : যখন খাদ্যদলা/কাইম (bolus/chyme) ডিওডেনামে প্রবেশ করে এর প্রাচীরের সংস্পর্শে আসে তখন হরমোনাল এবং স্নায়বিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। স্নায়বিক উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছালে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ বন্ধের এবং পাকস্থলি থেকে কাইমের প্রবেশ ধীরগতি হওয়ার নির্দেশনা প্রেরণ করে। এ সময় ডিওডেনামের মিউকোসা **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) ও সিক্রেটিন (secretin) হরমোনের নিঃসরণ ঘটায়। হরমোন দুটি রক্তস্রোতের মাধ্যমে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় এবং যকৃতে পৌঁছে। সিক্রেটিন পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ বন্ধ করে এবং কোলেসিস্টোকাইনিন পাকস্থলি থেকে খাদ্য ডিওডেনামে আসার গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত নিঃসরণ (Pancreatic Juice and Bile Secretion) : সিক্রেটিন এবং কোলেসিস্টোকিনিন উভয় হরমোনই অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সিক্রেটিন যকৃত ও অগ্ন্যাশয়কে বাই-কার্বনেট আয়ন উৎপাদনের জন্য উদ্দীপ্ত করে। ফলে অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। এ কারণে অম্লীয় অবস্থা প্রশমিত হয়। কোলেসিস্টোকাইনিন অগ্ন্যাশয়কে এনজাইম সৃষ্টির জন্য এবং পিত্তথলিকে পিত্ত নিঃসরণের জন্য উদ্দীপ্ত করে। পিত্ত এবং অগ্ন্যাশয় রস স্নায়ু প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভেগাস স্নায়ু যকৃত ও অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপ্ত করে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত করে।

100%

পরিপাকে হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের নিঃসরণ কয়েকটি নির্দিষ্ট হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোনগুলো পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রক্তবাহিকার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে পৌছে। হৃৎপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে পৌছায় এবং এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সঞ্চালন কাজকে উদ্দীপ্ত করে। নিচে খাদ্য পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তের গ্রন্থিগুলোর গাত্রের জি-কোষ থেকে গ্যাস্ট্রিন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসৃত হয়। এটি HCl এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্ননালি থেকে পাকস্থলিতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২. সিক্রেটিন (Secretin) : অন্ত্রের (ডিওডেনামের) মিউকোসা থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত (bile) ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন।

৩. কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin) : এর অপর নাম প্যানক্রিওজাইমিন। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হরমোনটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এটি পিত্তথলি থেকে পিত্ত বের হতেও উদ্দীপনা যোগায়।

৪. সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin) : এ হরমোনটি পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত ডি-কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলি রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণও হ্রাস করে।

৫. এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

৬. পেপটাইড YY (Peptide YY) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৭. এন্টেরোগ্যাস্ট্রোন (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide–GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলির বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে গাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড বলা হয়।

৮. এন্টেরোক্রাইনিন (Enterocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এটি লিবারকুন গ্রন্থিকে (crypts of liberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯. ডিওক্রাইনিন (Deocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এ হরমোন ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

১০. প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic Polypeptide) : এটি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১. ভিল্লিকাইনিন (Villikinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

১২. ভ্যাসোঅ্যাকটিভ ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (Vasoactive Intestinal Peptide) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলোকে প্রসারিত করে এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ বন্ধ করে।

১৩. ক্ষুধা ও তৃপ্তি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন : কতিপয় GI পেপটাইড যেমন ভেসোঅ্যাকটিভ ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (VIP), গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড-I (GLP-I), প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (PP), গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড (GIP), গ্রিলিন (Ghrelin) এবং পেপটাইড YY মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে রক্তে গ্রিলিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অপরদিকে খাদ্য গ্রহণের সময় রক্তে PP এবং PYY হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে খাবারে তৃপ্তি তৈরি হয়।

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক

পরিপাকস্থল	পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাক রস	পরিপাক রসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত "লালারস"	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. টায়ালিন ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	মল্টোজ গ্লুকোজ
পাকস্থলি	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত "পাকরস"	**প্রোটিন পরিপাককারী** ১. পেপসিন ২. জিলেটিনেজ	প্রোটিন জিলেটিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন পেপটোন ও পলিপেপটাইড
		লিপিড পরিপাককারী ১. গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ	মাখনের চর্বি	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস"	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. অ্যামাইলেজ ২. মল্টেজ	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	মল্টোজ গ্লুকোজ
		প্রোটিন পরিপাককারী ১. ট্রিপসিন ২. কাইমোট্রিপসিন ৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ ৬. ডাইপেপটাইডেজ ৭. কোলাজিনেজ	প্রোটিওজ ও পেপটোন প্রোটিওজ ও পেপটোন পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ পলিপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড কোলাজেন	পলিপেপটাইড পলিপেপটাইড সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড সরল পেপটাইড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. ফসফোলাইপেজ ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	চর্বি (লিপিড) ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল এস্টার	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ফ্যাটি এসিড ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. ল্যাক্টেজ ২. মল্টেজ ৩. সুক্রেজ ৪. অ্যামাইলেজ	ল্যাক্টোজ মল্টোজ সুক্রোজ স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সরল শর্করা
		প্রোটিন পরিপাককারী ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পেপটাইড অণু	অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড ফসফোলিপিড	মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন-কোলিন)
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী ১. নিউক্লিয়েজ ২. নিউক্লিওটাইডেজ ৩. নিউক্লিওসাইডেজ	নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড	মনোনিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ পেন্টোজ শুগার ও নাইট্রোজেন বেস

পরিপাককৃত খাদ্যদ্রব্যের (খাদ্যসার) শোষণ (Absorption of Digested Food)

যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার আন্ত্রিক এপিথেলিয়ামের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে।

পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয়না এবং পাকস্থলির প্রাচীরে ভিলাই না থাকায় সেখানে খাদ্যসার শোষণ খুব কম ঘটে। তবে পানি, অ্যালকোহল, স্যালাইন, গ্লুকোজ ও কয়েক প্রকার ওষুধ পাকস্থলিতে শোষিত হয়। আর বৃহদন্ত্র প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত না হওয়া পানির অধিকাংশটুকুই শোষণ করে।

পরিপাককৃত খাদ্যসার এবং ভিটামিন, পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা স্তরের **ভিলাই** (villi; একবচনে-villus) দ্বারা শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণ ভাঁজ হয়ে আঙ্গুলের মতো যে অতিক্ষেপ (০.৫ থেকে ১ মিলিমিটার দীর্ঘ) সৃষ্টি করে তাদেরকে **ভিলাই** বলে। ভিলাই হলো পরিশোষণের একক। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম প্রধানত ক্ষরণ কাজের সাথে যুক্ত। অপরদিকে জেজুনাম ও ইলিয়াম শোষণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রায় ৫০ লক্ষ ভিলাই (প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ১০–৪০টি) থাকে। ভিলাইয়ের শোষণতলের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ১০ বর্গমিটার। ক্ষুদ্রান্ত্রের **লুমেন** (lumen) বা ফাঁকা গহ্বরে খাদ্যকণা অতিক্রমের সময় খাদ্যসার শোষণের কাজ চলতে থাকে। ভিলাইয়ের আবরণী টিস্যুর (epithelial tissue) কোষসমূহের আবার সূক্ষ্ম অভিক্ষেপ (minute projections) থাকে যাদেরকে **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) বলা হয়। এগুলো একত্রিত হয়ে উপরিতলে **ব্রাশ বর্ডার** (brush border) সৃষ্টি করে শোষণতল আরও বাড়িয়ে দেয়। এ কোষগুলো পানি, খনিজ লবণ, খাদ্যসার ইত্যাদি শোষণ করে লসিকা ও রক্তসংবহনতন্ত্রে প্রেরণ করে।

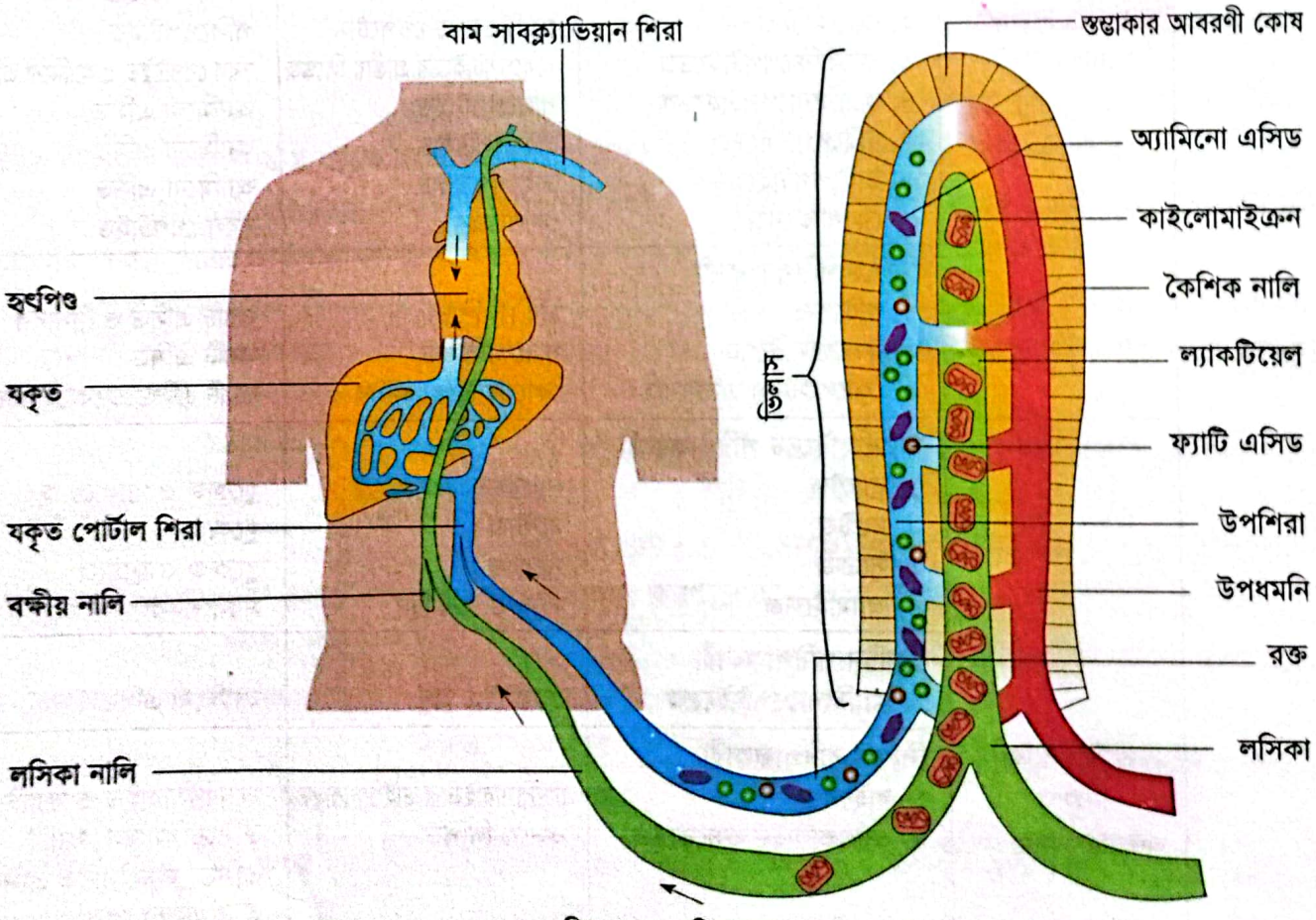

চিত্র ৩.১৭ : ভিলাসের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর শোষণ

শর্করা ও আমিষের সরল উপাদানগুলো ভিলাসের (ভিলাই এর একবচন) মধ্যে অবস্থিত রক্তে শোষিত হয়ে পোর্টাল রক্ত সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। স্নেহ দ্রব্যের সরল উপাদানগুলো ভিলাসের **ল্যাকটিয়েল** (lacteal)-এর মধ্যে শোষিত হয়ে লসিকাতন্ত্রে প্রবেশ করে। খাদ্য শোষণ প্রধানত দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়: ১. নিষ্ক্রিয় শোষণ–বিপাকীয় শক্তির (যেমন-ATP) প্রয়োজন হয় না এবং ২. সক্রিয় শোষণ–বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

নিচে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হলো–

১. কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate) : শর্করা প্রধানত মনোস্যাকারাইড বা একক শর্করারূপে শোষিত হয়। শর্করা পরিপাকের পর যেসব খাদ্য উৎপন্ন হয় সেগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি। ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষে সক্রিয় শোষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও অন্যান্য সরল শর্করা শোষিত হয়ে রক্তজালকের মাধ্যমে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে।

২. প্রোটিন বা আমিষ শোষণ (Absorption of Protein) : স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় আমিষ শুধু অ্যামিনো এসিডরূপে শোষিত হয়। অ্যামিনো এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়ে রক্তজালকের মাধ্যমে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে।

৩. লিপিড বা চর্বি শোষণ (Absorption of Lipid) : লিপিডের শোষণ কিছুটা জটিল। লিপিডের পরিপাকজাত বস্তু হচ্ছে–ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, কোলেস্টেরল, মনোগ্লিসারাইড ইত্যাদি। এদের মধ্যে গ্লিসারল ও অধিকাংশ ছোট ফ্যাটি এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বর থেকে সরাসরি সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (নিষ্ক্রিয় শোষণ) ভিলাসের প্রাচীরের শোষণকারী কোষে শোষিত হয় এবং সেখান থেকে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, বড় ফ্যাটি এসিড ও মনোগ্লিসারাইড পিত্তলবণ সহযোগে মাইসেলি (micelle) নামক ছোট ছোট স্নেহকণা গঠন করে। কোলেস্টেরল, চর্বি দ্রাব্য ভিটামিন ইত্যাদি মাইসেলির অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণকারী কোষের মুক্ত প্রান্তের সংস্পর্শে এলে পিত্তলবণ ছাড়া মাইসেলির অন্যান্য উপাদান মাইসেলি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণকারী কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। এসব উপাদান শোষণকারী কোষের ভিতর ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয়ে এবং কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপোপ্রোটিনের মোড়কে আবৃত হয়ে কাইলোমাইক্রন (chylomicron) নামক অপেক্ষাকৃত বড় বড় স্নেহকণা গঠন করে। এসব স্নেহকণা এক্সোসাইটোসিস (exocytosis; প্লাজমামেমব্রেনের মাধ্যমে পদার্থসমূহ কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় শোষণকারী কোষ থেকে বেরিয়ে ভিলাসের কেন্দ্রীয় লসিকানালি তথা ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শিরাতন্ত্রের রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. পানি শোষণ (Absorption of Water) : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থল। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিলাই-প্রাচীরের আবরণী কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ২০০-৪০০ মিলিলিটার পানি শোষিত হয়। শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে এবং ৭০–৮০% পানির শোষণ ঘটে বৃহদন্ত্রে।

৫. খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals) : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষ দ্বারা সক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬. ভিটামিন শোষণ (Absorption of Vitamins) : খাদ্যের ভিটামিন A, D, E, K ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। সাধারণ পিত্তলবণ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। ভিটামিন C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of Absorbed Food Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সাহায্যে প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া এবং অন্যদিকে শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ। শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের মেটালিক উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

শোষিত খাদ্যসারের পরিবহন ও পরিণতির প্রবাহচিত্র :

- গ্লুকোজ —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি উৎপাদন অথবা গ্লাইকোজেন গঠন।
- অ্যামিনো এসিড —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → প্রোটিন গঠন অথবা ইউরিয়া উৎপাদন।
- ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল —নিষ্ক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → ল্যাকটিয়েল → থোরাসিক লসিকা নালি → শিরাতন্ত্র → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → চর্বি গঠন অথবা শক্তি উৎপাদন।

বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

গঠন : খাদ্যের পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্য দেহে শোষণের পর যে অংশটুকু অপাচ্য থাকে বা শোষিত হয় না, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পিছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও খাঁজযুক্ত অংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। যথা–

(i) সম্মুখের ইলিয়াম সংলগ্ন স্ফীত গোল অংশটি **সিকাম** (caecum),
(ii) মধ্যবর্তী উল্টো U আকৃতির বড় অংশটি **কোলন** (colon) এবং
(ii) পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশটি **মলাশয়** (rectum)।

সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে, এর নাম **অ্যাপেনডিক্স** (appendix)।

কোলনের আবার ৪টি অংশ রয়েছে–

১. **উর্ধ্বগামী কোলন** (ascending colon),
২. **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse colon),
৩. **নিম্নগামী কোলন** (descending colon) এবং
৪. **সিগময়েড কোলন** (sigmoid colon)।

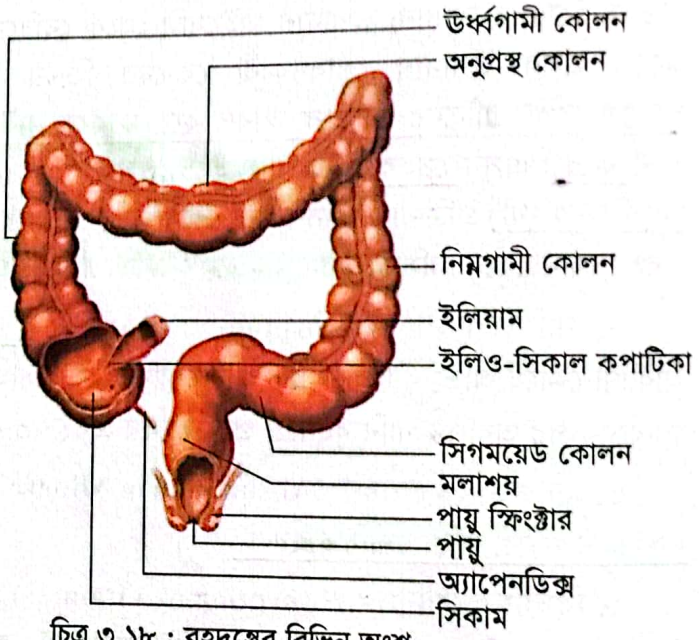

চিত্র ৩.১৮ : বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

কাজ : মানুষের বৃহদন্ত্র প্রধানত নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করে–

১. **ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া (Bacterial actions) :** বৃহদন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতির) মিথোজীবী হিসেবে বাস করে। এরা খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ও পাচন ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া বৃহদন্ত্রে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও অপাচ্য পলিস্যাকারাইডকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে অ্যাসিটিক এসিড, বিউটারিক এসিড ইত্যাদি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফ্যাটি এসিড (short chain fatty acid) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস মুক্ত করে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ফ্যাটি এসিড ব্যাকটেরিয়া ও কোলনের প্রাচীর-কোষে শক্তি জোগায়। বৃহদন্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন K ও B_{12}-এর ফলিক এসিড উৎপন্ন করে।

২. শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক-বর্জ্যে অবস্থিত পানির প্রায় ৭০-৮০% অভিস্রবণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার ধারণ করে। কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফলিক এসিড, ভিটামিন-B এবং K বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়।

৩. ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে অবস্থিত **গবলেট কোষ** (goblet cell) মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে।

৪. খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর অবশিষ্ট উপাদান ইলিওকোলিক পেশিবলয় অতিক্রম করে সিকাম ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় জমা থাকে।

৫. মল উৎপাদন : দৈনিক প্রায় ৩৫০ গ্রাম **তরল মন্ড** বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মন্ড থেকে শোষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৫ গ্রাম **আর্দ্র মল** (faeces) উৎপন্ন হয়।

৬. বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশণ: বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে মল পায়ুনালি দিয়ে পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

মলত্যাগ (Defaecation)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে **মলত্যাগ** বা **ডেফিকেশন** বা **ইজেসশন** (egestion) বলে। খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত ও দেহে পুষ্টিমূল্যহীন বস্তুকে **রাফেজ** (roughage) বলে। এ রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) এর মতো কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। এ সময়ের ভিতর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাস (যেমন-হাইড্রোজেন সালফাইড) উৎপন্ন হয় এবং মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (defaecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সঙ্কোচনের ফলে পায়ুনালির ভিতরে স্ফিংক্টার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ুপথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে একবার কিংবা দুবার, আর শিশুরা বেশ কয়েকবার মলত্যাগ করে।

পরিপাক ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পরিপাক (Digestion)	শোষণ (Absorption)
১. প্রক্রিয়া	জটিল ও অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল ও দ্রবণীয় খাদ্যসারে পরিণত হয়।	পরিপাককৃত খাদ্যসার রক্ত ও লসিকায় প্রবেশ করে।
২. সংঘটনস্থল	মুখবিবর, পাকস্থলি ও অন্ত্রের গহ্বরে সংঘটিত হয়।	অন্ত্রের ইলিয়াম ও জেজুনামের ভিলাইয়ে সংঘটিত হয়।
৩. এনজাইমের প্রয়োজনীয়তা	এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয়।	এনজাইমের প্রয়োজন হয় না।
৪. শক্তির প্রয়োজনীয়তা	এটি একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এতে জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়।	এটি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয় প্রক্রিয়ায় ঘটে।
৫. খাদ্যের পরিবর্তন	খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।	খাদ্যের গাঠনিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

ব্যবহারিক অংশ

স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

❐ **যকৃতের অনুচ্ছেদ (Section through liver)**

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. যকৃত কতকগুলো ক্ষুদ্র খন্ড বা হেপাটিক লোবিউল (lobule)-এ বিভক্ত।

২. প্রত্যেক লোবিউল অসংখ্য বহুভুজাকার হেপাটিক কোষ (hepatic cell)-এ গঠিত।

৩. বহুভুজাকার কোষগুলো এক বা দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।

৪. লোবিউলের মাঝে মাঝে সাইনুসয়েড (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে।

৫. প্রত্যেক লোবিওলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা অবস্থিত। কোষের মাঝে মাঝে রয়েছে কৈশিকনালি ও পিত্তনালি।

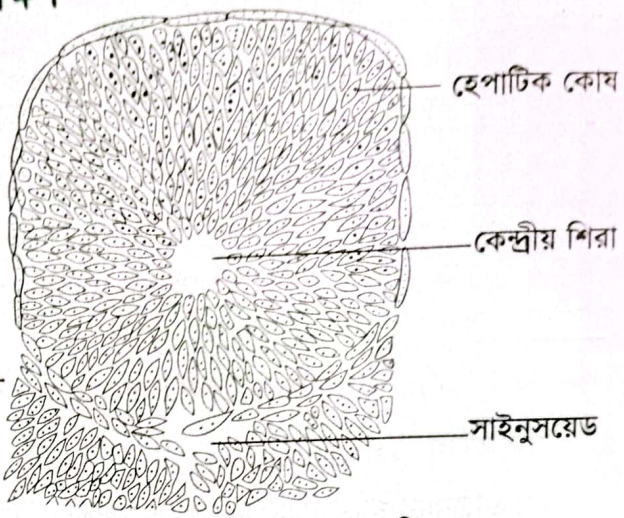

চিত্র ৩.১৯ : যকৃতের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

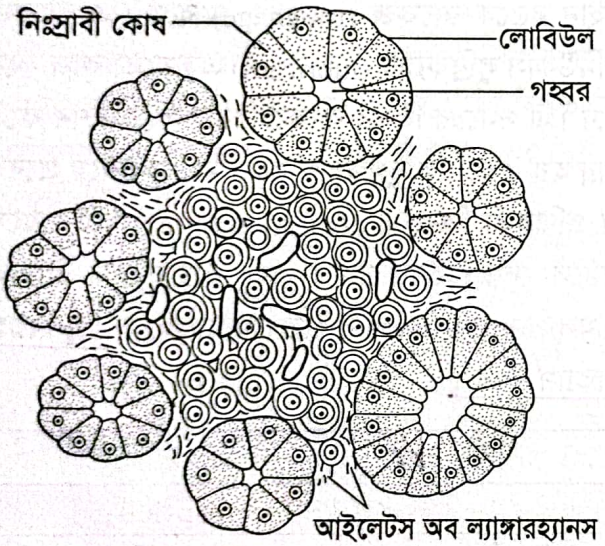

❐ **অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ**

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. ক্ষরণকারী কোষে গঠিত ও কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত লোবিউল বা অ্যাসিনাস (acinus) উপস্থিত।

২. লোবিওলের ফাঁকে ফাঁকে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans) নামক কোষপুঞ্জ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।

৩. কোষগুলোর মধ্যে রক্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালি আছে।

৪. অ্যাসিনাসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যোজক টিস্যু দেখা যায়।

চিত্র ৩.২০ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

❐ **পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ**

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীর পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত, যথা–সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা।

২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত। সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি, স্নায়ু প্রভৃতি ধারণ করে।

৩. মিউকোসা স্তর থেকে রুগী (rugae) নামক কতকগুলো অভিক্ষেপ বের হয়েছে।

৪. মিউকোসায় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (gastric gland) দেখা যায়।

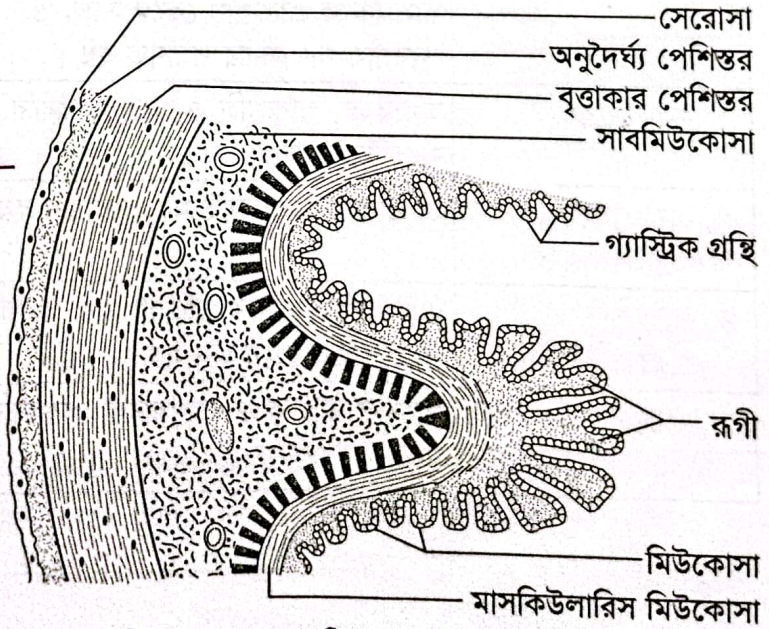

চিত্র ৩.২১ : পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

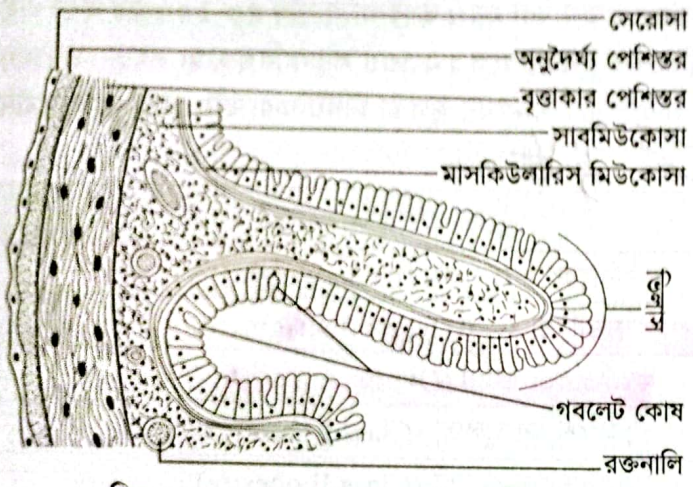

চিত্র ৩.২২ : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর বিদ্যমান।
২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত।
৩. সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি ও স্নায়ু সমৃদ্ধ।
৪. মিউকোসা থেকে ভিলাই (villi; একবচনে– villus) নামের আঙ্গুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ বের হয়। মিউকোসাতে গবলেট ও শোষণক্ষম কোষ রয়েছে।

স্থূলতা (Obesity)

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবচন। আগে সাধারণ মানুষের চোখে স্বাস্থ্যবান মানুষ বলতে দীর্ঘকায় ও মোটা-সোটা ব্যক্তিকে বোঝাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে 'মোটা-সোটা' ব্যক্তি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ নয়। স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে : **রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে** (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 2009)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলে। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে **দেহের ওজন সূচক** বা **বডি মাস ইনডেক্স** (Body Mass Index = BMI) বলে। BMI কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{BMI} = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার}^2\text{)}}$$

একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI-এর বিস্তৃতি হলো ১৮.৫০–২৪.৯৯ পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান ২৫ বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে **স্থূলকায়** বা **মোটা** বলা যাবে।

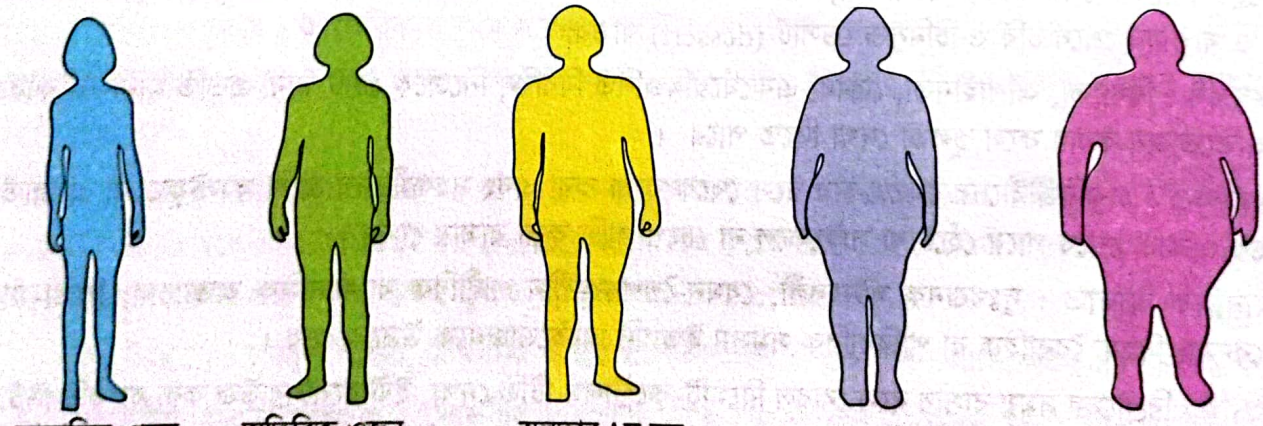

চিত্র ৩.২৩ : BMI নির্ণয়

পাশাপাশি এই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে তাকে নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি ৫০-১০০ হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা ব্যাধিগ্রস্থ **বিভৎস স্থূলতা** বলে। ২০০০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) BMI-এর এই মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এর সাহায্যে অতি সহজে মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়। BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিচের ছকে প্রকাশ করা হলো –

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1	<18.5 kg/m²	শরীরের ওজন কম (Underweight)
2	18.5 – 24.99 kg/m²	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
3	25.0 – 29.99 kg/m²	অতিরিক্ত ওজন (Overweight)
4	30.0 – 34.99 kg/m²	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
5	35.0 – 39.99 kg/m²	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
6	≥ 40.0 kg/m²	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity)

স্থূলতার ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ স্থূলতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। **চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যারিয়াট্রিকস** (Bariatrics) **বলে**। স্থূলতার কারণে যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে–করোনারি হৃদরোগ, টাইপ–২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

স্থূলতার কারণ (Causes of Obesity)

ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে স্থূলতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক পর্যায়ে সুলভ ও মজাদার খাবার, গাড়ীর উপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়া এবং উৎপাদন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারকে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সব কারণকে স্থূলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **জিনগত** : সফল বিপাক এবং দেহে মেদ সঞ্চয় ও বিস্তারের ক্ষেত্রে **গুচ্ছ জিন** ভূমিকা পালন করে। স্থূলকায় বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়। নিম্ন বিপাক হার এবং জিনগত সংবেদনশীলতা স্থূলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পারিবারিক জীবনযাত্রা** : পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস পারিবারিকভাবেই গড়ে উঠে। চর্বিযুক্ত ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সব্জি ও অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা; দামী রেস্তোঁরায় খাওয়ার আগে ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৩. **আবেগ** : বিষণ্নতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা প্রভৃতি মানসিক কারণে ক্রমাগত অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে ।

৪. **কর্মক্ষেত্র** : চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে ঠায় বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা এ জাতীয় খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

৫. **মানসিক আঘাত** : দুঃখজনক ঘটনাবলী, যেমন-শৈশবকালীন শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার; পিতা-মাতা হারানোর বেদনা; কিংবা বৈবাহিক বা পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি অতিভোজনকে উসকে দেয়।

৬. **বিশ্রাম** : বিশ্রামের সময় বাসায় বসে কেবল রিমোট-কন্ট্রোলড টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা বা কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

৭. **লিঙ্গভেদ** : গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে। এ কারণে নারী-পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৮. **গর্ভাবস্থা** : প্রতিবার গর্ভধারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেহে ৪-৬ পাউন্ড ওজন বেড়ে যায়।

৯. **নিদ্রাহীনতা** : রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

১০. **শিক্ষার অভাব** : সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১১. **অসুখ** : পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome) হলে নারীদেহে স্থূলতা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া, কুসিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome), হাইপোথাইরয়ডিজম (Hyporthyroidism) হলেও স্থূলতা হতে পারে।

১২. **কতক ওষুধ** : কিছু ওষুধ স্থূলতার সম্ভাবনাকে বাড়াতে পারে, যেমন–কর্টিকোস্টেরয়েডস, বিষণ্নতা দূর করার ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস), জন্মবিরতিকরণ বড়ি প্রভৃতি। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

স্থূলতার কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যা (Health Problem of Obesity) 3*

১. স্থূলতার কারণে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৬–৭ বছর কমে যায়।

২. স্থূলতার কারণে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে বেশি কোলেস্টেরল, উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায়।

৩. দেহে মেদের পরিমাণ বেড়ে গেলে ইনসুলিনের সাড়া প্রদান হ্রাস পায়। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

৪. অতিরিক্ত মেদের কারণে পুরুষদের ৬৪% ও মেয়েদের ৭৭% ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. স্থূলতার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে হার্ট ডিজিজ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, হার্ট ফেইলিওর, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, ঋতুস্রাবজনিত অসুস্থতা, বন্ধ্যাত্ব, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিলতা ইত্যাদি। স্থূলতার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি নতুন শাখা সৃষ্টি হয়েছে। একে **ব্যারিয়াট্রিকস** (Bariatrics) বলে। বিজ্ঞানের এ শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

স্থূলতা প্রতিরোধ (Prevention of Obesity)

স্থূলতাজনিত ঝুঁকির মধ্যে কেউ থাক বা না থাক সবারই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। স্থূলতা প্রতিরোধের জন্য নিচে উল্লেখিত আচরণ-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ, পালন ও অনুসরণ করতে হবে।

১. **নিয়মিত ব্যায়াম** : **আমেরিকান কলেজ অব স্পোর্টস মেডিসিন** এর গবেষণায় প্রতিদিন ২৫-৩০ মিনিট হালকা অথবা ভারী ব্যায়াম করলে দেহের ওজন বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। দ্রুত হাঁটা, সাইক্লিং, সাঁতার প্রভৃতি ধরনের ব্যায়ামের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

২. **স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ** : প্রতিদিন আঁশ (fiber) যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। দানাযুক্ত খাবার (whole grain food) গ্রহণ করতে হবে এবং মিহিগুঁড়া করা (refine) খাবার কম খেতে হবে। যেমন-মিহি গুঁড়া দিয়ে তৈরি ময়দার রুটির পরিবর্তে বাদামি চালের প্রস্তুতকৃত খাবার স্থূলতা প্রতিরোধক।

৩. **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ** : চর্বিযুক্ত খাবার, মিষ্টিসমৃদ্ধ আহার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. **লোভনীয় খাবার পরিহার** : লোভনীয় খাবারের দিকে (ফাস্ট ফুড বা জাংক ফুড) হাত বাড়ানো ঠিক নয়। ভুক্তভোগীরা যেন আহার গ্রহণের সময় তাদের জন্য নির্ধারিত খাবার তালিকা কঠোরভাবে মেনে চলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।